স্ফুলিঙ্গ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

আগমনী প্রকাশক
৯৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

প্রকাশক :—
শ্রীসুব্রত চৌধুরী
আগমনী প্রকাশক
৯৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

প্রথম সংস্করণ—১৩৬৪

—আড়াই টাকা—

মুদ্রাকর :—
শ্রীসত্যকুমার চ্যাটার্জ্জি
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
৪২এ, মলঙ্গা লেন, কলিকাতা-১২

স্মরণায় প্রদত্তমিদমর্ঘং দেশকর্ম্মিণাম্

করকমলেষু—

পরিচিতি

স্ফুলিঙ্গের বিষয়বস্তু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে অংশ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার মধ্যে পড়ে।

ইহার পূর্ববর্তী দুইখানি উপন্যাস "রাজনগর" ও "দেবানন্দ" আন্দোলনের ১৯০৫—১৯০৬ (প্রথমার্দ্ধ) এবং ১৯০৬—১৯০৮ (প্রথমার্দ্ধ) পর্যন্ত ইতিহাস আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে।

স্ফুলিঙ্গে বিষয়বস্তুর বর্ণনায় বিভিন্নখাতে প্রবাহিত আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইবে, যদিও স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের ধারা। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ঘটনা ও দলীয় রাজনীতির বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে জাতির ঐক্য ও দেশের মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকোণ হইতে।

রাজনগর ও দেবানন্দের মত স্ফুলিঙ্গ ডকুমেণ্টারী উপন্যাস, ঐতিহাসিক রোমান্স নয়। ডকুমেণ্টারী উপন্যাস অর্থাৎ পরাধীন দেশের জাতীয় আন্দোলনের এবং সেই আন্দোলনের বাধাবিপত্তির এবং দুর্বলতার প্রামাণিক ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। এই ইতিহাস সম্পূর্ণ অবিকৃত ও নির্ভরযোগ্য। গল্প আবর্তিত হইয়াছে সমসাময়িক কালের ইতিহাসের আবর্তন অনুসরণ করিয়া। আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন চিত্রায়নে নির্দিষ্ট ভূমিকায় দেখা দিলেও গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়াছে নিজ নিজ ধারায়, মানুষ হিসাবে তাহাদের স্বভাবের তাগিদে। অপ্রধান চরিত্রগুলি তৎকালীন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের চিত্র পরিস্ফুটনে সাহায্য করিয়াছে।

আর একটি কথা বলিবার আছে। উপন্যাসে ১৯০৮—১৯১৪ পর্যন্ত কয় বৎসরের দেশের শিক্ষিত সমাজের যে জীবন, যে আদর্শ, চিন্তা, ভাব ও আচরণ বর্ণনায় ও চরিত্র রূপায়নে প্রকাশ পাইয়াছে সম্পূর্ণরূপেই তাহা সে যুগের। সমগ্র উপন্যাসটি দেশের ইতিহাসের এক অতীত অধ্যায়ের আলেখ্য। অধ্যায় অতীত কিন্তু দেশের ইতিহাস চলিষ্ণু, নূতন নূতন অধ্যায়ের দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্নগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া ক্লান্তিহীন চরণে আগাইয়া চলিয়াছে অনাগতের সন্ধানে।

ইতিহাসের পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ের চিত্রণে যে সকল চরিত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বর্তমান উপন্যাসে তাহাদের কয়েকটিকে রাখা হইয়াছে। এই চরিত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা আবশ্যক।

ইন্দ্রনারায়ণ—রাজনগরের নবীন ভূস্বামী ও জাতীয়তাবাদী কর্মী

লক্ষ্মী—জীবানন্দের জেষ্ঠা কন্যা ও ইন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী

জীবানন্দ—রাজনগরবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

ত্রিনয়নী—ঐ স্ত্রী

দেবানন্দ—জীবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র, ইন্দ্রনারায়ণের গুরু ও বন্ধু, মাণিকতলা বোমার মামলার আসামী

সরস্বতী ও উমানন্দ—জীবানন্দের কনিষ্ঠা কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র।

অন্য চরিত্রগুলি নূতন।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১

আজ তিন বৎসর লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছে। মধ্যম তরফের বৃহৎ সংসার তাহার গৃহিণীপনায় সুশৃঙ্খলে চলিতেছে। কি বা লক্ষ্মীর বয়স? ইন্দ্র ভাবিয়া পায় না এইটুকু বয়সে এত দিকে দৃষ্টি রাখা লক্ষ্মীর পক্ষে কি করিয়া সম্ভবপর হয়।

লোকে তাহার গৃহিণীপনার যত সুখ্যাতি করুক লক্ষ্মী কিন্তু জানে তাহার মনের চারি আনা অংশ মাত্র সে সংসারের কাজে দেয়, বাকী বারো আনা পড়িয়া থাকে স্বামীর উপর। সংসারের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা লক্ষ্মীর নিজের হাতে। স্বামীর স্নান, আহার, বিশ্রাম, আরামের ব্যবস্থা, পোষাকপরিচ্ছদ লক্ষ্মীর অনুশাসনের মধ্যে। তাঁহার বৈষয়িক কর্ম, সেবকাশ্রমের কাজ, পড়াশোনা ইত্যাদি লক্ষ্মী নিজের অধিকারের বাহিরে রাখিয়াছে। কোন বিষয়ে ইন্দ্র পরামর্শ চাহিলে তাহার মুখে সব কথা শুনিয়া লক্ষ্মী নিজের বিবেচনামত পরামর্শ দেয়, নহিলে কোন কথা বলে না।

ইন্দ্র এই ব্যবস্থা বিনা বাক্যে মানিয়া লইয়াছে।

লক্ষ্মীর এপর্যন্ত কোন সন্তান হয় নাই। ইহা লইয়া আত্মীয় স্বজন আলোচনা করেন, লক্ষ্মীর নিজের মনে কোন দুঃখ আছে কিনা ইন্দ্র জানে না, কিন্তু সে নিজে বিন্দুমাত্র অসুখী নয়। লক্ষ্মীর ভালবাসা তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সে ভালবাসার মধ্য দিয়া ইন্দ্র আপনাকে নূতন করিয়া চিনিতেছে। তিন বৎসরেও এ চেনা সম্পূর্ণ হয় নাই।

সেদিন বিকালের দিকে বৈঠকখানা দালানের বারান্দায় বসিয়া ইন্দ্র একখানি বই পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিতেছিল।

বৈঠকখানা দালানের দক্ষিণদিকে খানিকটা খোলা জায়গা ছিল। সেখানে নূতন বাগান তৈয়ারী হইতেছে। লক্ষ্মীর সখ। সকালে উঠিয়া স্নান সারিয়া সে পূজা করে। পূজার ফুল সে নিজে তুলিবে বলিয়া নূতন বাগান হইতেছে,

কাছারী বাড়ীর সম্মুখের বাগানে নিজে গিয়া ত সে আর ফুল তুলিতে পারে না।

শুধু বাগান নয়, আরও অনেক কল্পনা আছে লক্ষ্মীর মাথায়। বাগানের মধ্যে একটা ইটের গোল লাল রং করা বেদী হইবে তাহাদের দুই জনের বসিবার জন্য। বেদীর চারদিকে সরু বাখারির বেড়া হইবে, যাতায়াতের জন্য খানিকটা ফাঁক থাকিবে। এই বাখারির বেড়ার গায়ে তরুলতা উঠিবে। এই তরুলতা যখন বাড়িয়া বেড়া ঢাকিয়া ফেলিবে—

বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে শব্দ শুনিয়া ইন্দ্র ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। দরজার আড়ালে তাহার দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী মৃদু হাসিতেছে।

ইন্দ্র চাহিয়া দেখিল লক্ষ্মীর বৈকালিক প্রসাধন শেষ হইয়াছে। সে একখানি জমকালো জামদানি শাড়ি পরিয়াছে আজ, শাড়িখানিতে তাহাকে মানাইয়াছে চমৎকার।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—কাছে এসো দেখি। মনে হচ্ছে তোমার সই ঠাকরুণ এসেছেন।

লক্ষ্মী হাসিয়া ঘরের মধ্যে এক পা সরিয়া গেল। বলিল—সই জোর করে পরিয়ে দিল।

পিছনে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া সে বলিল—সই পালাচ্ছে। সেই ত এখানে ধরে আনলো জোর করে।

লক্ষ্মীর সইয়ের নাম কামিনী বৌ। কামিনী বৌয়ের বয়স লক্ষ্মীর বয়সের দেড়গুণ, তাহা হইলেও সে লক্ষ্মীর সই।

কামিনী বৌ গ্রামের এক দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের গৃহিণী। খুব লম্বা চওড়া, লোকে বলিত মেয়ে কাবুলীওয়ালা। গায়ের রং ফরসা। চোখা নাক, নাকের ডগা সম্মুখে একটু বাঁকিয়াছে। মেয়ে মানুষের ঐ রকম নাক নাকি কুলক্ষণ। লোকে বলিত সেই জন্য নাকি বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল হইলেও কামিনী দরিদ্রের ঘরে পড়িয়াছিল। সম্মুখে দুইটা দাঁত একটু উঁচু, রীতিমত মজবুত দুই চোয়াল। এই চোয়ালের জোরে কামিনী বৌ আস্ত সুপারি মাড়ির দাঁতে আটকাইয়া এক চাপে ভাজিয়া ফেলিত। এই কৃতিত্বের জন্য গ্রামে সে "সুপারি-ভাজা কামিনী বৌ" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

কামিনী বৌয়ের পরিবার উপযুক্ত শাড়ি দোকানে কিনিতে পাওয়া যাইত না। রাজনগরের জোলাদের কাছে ফরমায়েস দিয়া তাহার জন্ম শাড়ি তৈয়ারী করাইতে হইত।

কাজকর্মে কামিনী বৌ খুব খাটিতে পারিত। একা হাতে তিন চারি শত লোকের রান্না করিতে পারিত সে। এত কাজের মানুষ বলিয়া বড় বড় ক্রিয়া কর্মের সময়ে লোকে তাহাকে খোশামোদ করিয়া ডাকিয়া লইয়া যাইত।

কামিনী বৌয়ের স্বামীর চেহারা ছিল তাহার চেহারার একেবারে বিপরীত। বেঁটে, কালো, রোগাটে মানুষ। মাথা জুড়িয়া টাক। আগে রাজনগরের এক জমিদার সরিকের বাড়ীতে নায়েবের কাজ করিত। তহবিল ভাঙ্গিয়া জেলে যাইবার মত হইয়াছিল, কামিনী বৌয়ের চেষ্টায় বাঁচিয়া যায়। স্বামী মনিবের তহবিল ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া কামিনী বৌ নাকি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর কোমর ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ঘরের রোয়াক হইতে উঠানে ফেলিয়া দিয়াছিল। সাতদিন ভদ্রলোক বিছানা হইতে উঠিতে পারে নাই গায়ের ব্যথায়। মনিবপক্ষের কানে এই কাহিনী পৌঁছিলে তাঁহারা বলিলেন জেলের অধিক শাস্তি বেচারার ঘরেই হইল, আর জেলে পাঠাইয়া কি হইবে।

পূজার সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া কামিনী বৌয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর খুব ভাব হইয়া গেল। তারপর তাহারা সই পাতাইল। মাঝে মাঝে কামিনী বৌ আসিয়া লক্ষ্মীকে সাজাইয়া দেয়, নিজের হাতে ভাল ভাল রান্না করিয়া ইন্দ্র ও লক্ষ্মীকে খাওয়ায়। লক্ষ্মীও তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করে।

তাহার আহ্বানে লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যে সরিয়া যাইতে দেখিয়া ইন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল।

বলিল—তোমার সই ভাল করেন নি। অনিচ্ছুক মানুষকে জোর করে আনা কি ভাল?

লক্ষ্মীর ঘরের মধ্যে আরও সরিয়া গেল। হাসিমুখে বলিল—অনিচ্ছুক কি করে বুঝলে?

ইন্দ্র—অনিচ্ছুক না হলে কেউ পালায়? সই কেন তোমাকে ধরে এনেছেন জানো?

লক্ষ্মী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তেমনি হাসিয়া বলিল—কি করে জানবো ? সই আমাকে তো বলে নি।

ইন্দ্র তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—বাঃ, এ যে দেখছি স্বয়ং ইন্দ্রাণী।

লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া স্বামীর মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিল, তখনই মাথা নামাইল। ইন্দ্র দেখিল স্ত্রীর চোখে এক আশ্চর্য আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চিনিল লক্ষ্মীর অন্তরতম হৃদয় হইতে বিচ্ছুরিত এ সেই আলো যাহার মায়া স্পর্শে তাহার পৃথক সত্ত্বার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়।

গত তিন বৎসরে এই আলোর স্পর্শ সে মাঝে মাঝে পাইয়াছে।

ইন্দ্র সর্বদা অনুভব করে স্নেহে কোমল, আগ্রহে উন্মুখ, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ একটি হৃদয়, অতিশয় শান্ত, আয়ত দুইটি চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ আলোক মণ্ডল রচনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে বেষ্টন করিয়া। কবে হইতে লক্ষ্মীকে ইন্দ্র ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহার মনে পড়ে না। বিবাহের পরে সে উপলব্ধি করিল তাহার ভালবাসা লক্ষ্মীর রূপকে আশ্রয় করিয়া জন্মে নাই, জন্মিয়াছিল লক্ষ্মীর মধ্যে তাহার নিজের হৃদয়ের ও মনের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করিবার আশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া। সে আশ্বাস মিথ্যা হয় নাই সে জানিত। সে জানায় যেন আশা মিটে নাই তাই লক্ষ্মীর মনের গোপন কথা জানিবার জন্য সে লক্ষ্মীকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কবে হইতে সে ইন্দ্রকে ভালবাসে, কতখানি ভালবাসে। প্রশ্ন শুনিয়া লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চোখে এক আশ্চর্য আলো ফুটিয়া উঠিল। ইন্দ্রের মনে হইল সেই আলোর প্রভায় লক্ষ্মীর সমগ্র হৃদয়খানি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। লক্ষ্মী চোখ বুঁজিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল। ইন্দ্রের কি মনে হইল লক্ষ্মীর মুখখানি বুকে চাপিয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল—আমার কথার উত্তর তো দিলে না।

তবু লক্ষ্মী উত্তর দেয় না। ইন্দ্র কোন মতে ছাড়িবে না। স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া রাখিয়াই লক্ষ্মী অবশেষে অস্ফুট স্বরে বলিল—তোমার টানেই তো আমি এসেছি। তুমি যে আমার জন্মজন্মান্তরের দেবতা।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র মনে মনে হাসিয়াছিল। হাসিয়াছিল লক্ষ্মীর মনের কথা

প্রকাশ করিবার অপূর্ব ভাষা শুনিয়া। ভাষা যেমনই হউক লক্ষ্মী যে তাহার বিশ্বাসমত সত্য কথাই বলিল তাহা সে অবিশ্বাস করে নাই কোনদিন।

স্বামী তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, লক্ষ্মী আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কি ভাবিয়া আঁচল গলায় জড়াইয়া তাঁহার পায়ে মাথা রাখিল কিছুক্ষণ, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দ্রের চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। সে বলিল—কি হল? হঠাৎ প্রণাম করে বসলে যে?

স্বামীর ভাব দেখিয়া লক্ষ্মী মৃদু হাসিল। বলিল—ইচ্ছে হল।

ইন্দ্র একটু গম্ভীর স্বরে বলিল—স্বামীকে অত দেবতা বানিও না লক্ষ্মী, মানুষ বলে ভেবো মাঝে মাঝে।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, ভাববো। নূতন শাড়ি পরেছি, তাই প্রণাম করলাম।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—তাই বটে। আমি ভেবে মরছিলাম। মানুষ স্বামী কি চায় জানো?

লক্ষ্মী এক পা পিছাইয়া গিয়া হাসিয়া বলিল—না, তাতো জানিনে।

অন্দরের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল—সই হয়ত আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, আমি যাই।

ইন্দ্র—সই আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন? যাও তবে। আমি একটু ঘুরে আসছি। আদিনাথ না থাকায় সেবকাশ্রমের কাজে কিছু গোলমাল হচ্ছে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ইন্দ্র সেবকাশ্রমে যাইবার পথ ধরিল।

ইন্দ্রের সেবকাশ্রমের পরিচয় আগে দেওয়া হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজ তিন বৎসর তাহা চালাইয়া আসিয়াছে। যে অর্থ ও পরিশ্রম সে ইহার জন্য ব্যয় করিয়াছে তাহার অনুপাতে ফল কতখানি হইয়াছে ইন্দ্র তাহার হিসাব করিতে চাহে না।

এই সেবকাশ্রমের কাজের মধ্য দিয়া সে দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। উকিল, ব্যারিষ্টার, পেশাদার রাজনীতিকের কনষ্টিট্যুশনাল আন্দোলনের প্রতি তাহার আকর্ষণ নাই,

বক্তৃতাসর্বস্ব ও কাগুজে আন্দোলনের উপর তাহার ভক্তি নাই, একস্‌ট্রিমিষ্ট ও মডারেট দলের মধ্যে বিবাদ তাহার আগ্রহ উদ্রিক্ত করে না। তাহার মতে দেশের কাজ করিবার দুইটি মাত্র পন্থা আছে, বিপ্লবী পন্থা ও বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পন্থা। ঘটনা পরম্পরায় বিপ্লবী পন্থায় সে অগ্রসর হইতে পারে নাই, অগ্রসর হইয়াছিল দেবানন্দ। কোন বন্ধন, কোন বাধা দেবানন্দকে রুখিতে পারে নাই। ইন্দ্রকে বাছিয়া লইতে হইয়াছিল বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পন্থা।

বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার অর্থ বোমা, রিভলবার সংগ্রহ বা তৈয়ারী করা বা উহা ব্যবহার করিবার শিক্ষা নহে; উহার অর্থ দেশের লোকের মনকে অনন্যনির্ভর, স্বাবলম্বী, স্বাধীন হইবার শিক্ষা দেওয়া, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ করা। এই চেতনার উন্মেষ হইলে দেশের লোকের মন আপনা হইতে বিপ্লবমুখী হইবে। নিজের ব্যক্তিগত মতামত ও পারিবারিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই পথই তাহাকে বাছিয়া লইতে হইয়াছিল।

এই কাজেও বিঘ্নের অন্ত ছিল না। প্রথম বিঘ্ন পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দ্বিতীয় বিঘ্ন প্রতিবেশীদের অনেকের বিরোধিতা, তৃতীয় বিঘ্ন ভূতপূর্ব সহকর্মীদের অনেকের মনোভাবের বিস্ময়কর পরিবর্তন, চতুর্থ বিঘ্ন এবং ইহাই প্রবলতম বিঘ্ন, অধিকাংশ কর্মীর আন্তরিকতার অভাব।

অনেকদিন হইতে পুলিশ সেবকাশ্রমের উপর নজর রাখিয়াছে। গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টার রাজেন বাবুর পুত্র রাঘব দারোগার চাকুরি পাইবার পর হইতে পুলিশের উপদ্রব আরও বাড়িয়াছে।

গ্রামের অনেকে ইহাকে সুদৃষ্টিতে দেখেন না। প্রবীণ দলের কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন "ভারত উদ্ধার সমিতি"। ইন্দ্রের হিতৈষী সাজিয়া দুই একজন প্রবীণ বলেন—শুনি ভারত উদ্ধার সমিতির জন্য জলের মত টাকা খরচ করছ। অল্প বয়সে বিষয় হাতে পেয়েছ বাবা, একটু সামলে চলা ভাল। যত রাজ্যের বখাটে, বাউণ্ডুলে ছোকরা জুটিয়েছ, দিব্যি তোমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে রাজার হালে খাচ্ছে বসে বসে।

কেহ আবার দেখা হইলে মুচকিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—বাবা, ভারত উদ্ধার কতদূর এগুলো?

ইন্দ্র চুপ করিয়া তাঁহাদের কথা শোনে। কখনও বা হাসিয়া জবাব দেয়—তেমন এগুচ্ছে কই? আপনারা ত উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল নন।

সে জানে কোন ভাল কাজকে বিদ্রূপ করিয়া খেলো প্রতিপন্ন করিতে পারিলে গ্রামের কতকগুলি বয়স্ক লোক একটা মহৎ দায়িত্ব পালন করিলেন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু নবীনদলের কতকগুলি লোকের বিরুদ্ধতা বিপদজনক। প্রকাশ্যে কোন অনিষ্ট করিবার সাহস না পাইয়া ইহারা গোপনে পুলিশের কান ভারী করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে তাহার সহকর্মী ছিল। ভলান্টিয়ার হইয়া বিলাতী কাপড়, লবণ, চিনির দোকানে পিকেটিং করিয়াছে, লোকের সেবা করিয়াছে, লাঠি খেলিয়াছে। এখন পুলিশের ভয়ে সব ছাড়িয়া দিয়া দশ পাঁচ টাকা লাভের আশায় গুপ্তচর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার একটু কমিতে ইহাদের চরিত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

গ্রামের কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে এখনও আশ্রমে আসে। আসে কতকটা ইন্দ্রের সঙ্গে বাধ্যবাধকতায়, তাহাদের পূর্বের আগ্রহ আর নাই। তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—এ সব করে কি হবে? চরকা কেটে, তাঁত বুনে কি আর ইংরাজ তাড়ানো যাবে?

ইন্দ্র তাহাদের অভিযোগের কথা শুনিয়া বলে—ইংরাজ তাড়াবার ভার কেউ তোমাদের হাতে তুলে দেয়নি, ও কথা নাই বা ভাবলে। যে সামান্য কাজের ভার দেয়া হয়েছে তাই করো না।

তাহারা ইন্দ্রের মুখের উপর কোন জবাব দিত না, ইন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই যেন বুঝিতে চাহিত না সামান্য লোক সেবার কাজ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার মত ছেলে আমাদের ভদ্রঘরে খুব কম জন্মায়।

সেবকাশ্রমের বারো আনা কর্মী নিম্নশ্রেণীর ছেলে, নমশূদ্র, কৈবর্ত, তাঁতী, কুমোর ইত্যাদি। কয়েকটি মুসলমান ছেলেও আছে। ইহাদের অনেকেই ভিন্নগ্রাম হইতে আসিয়াছে।

সেবকাশ্রমের গোলমাল মিটাইতে গিয়া ইন্দ্র দেখিল আদিনাথ না আসিলে তাহার একার পক্ষে সে কাজ করা সময় সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে দেবানন্দের মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য তাহার কলিকাতা রওনা হইবার দিন আসিয়া

পড়িল। আদিনাথকে শীঘ্র ফিরিবার জন্য তাগাদা দিয়া সে কলিকাতা রওনা হইল।

২

কলিকাতা আসিয়া ইন্দ্র তাহার পরিচিত এক হোটেলে উঠিয়াছিল। পরদিন তাহার মাতুলপুত্র দেবনাথ ও তাহার স্ত্রী রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে উভয়ে মিলিয়া হোটেলে উঠিবার জন্য অনুযোগ করিল। তাহারা ইন্দ্রের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বাড়ীর গাড়ী পাঠাইয়া হোটেল হইতে ইন্দ্রের জিনিস পত্র আনাইল।

দেবনাথ কয়েক বৎসর হইল ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিল। যথারীতি হাইকোর্টে যাতায়াত করিত, সমবয়সী ব্যারিষ্টার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমাইয়া বাড়ী ফিরিত। এটর্নী বন্ধুদের অনুগ্রহে দুই একটা কেস মাঝে মাঝে পাইত। ব্যয়বহুল সংসার যাত্রা চলিত বাড়ী হইতে প্রেরিত টাকায়। টাকা আসিতে দেরি হইলে বা ফুরাইয়া গেলে ধার করিতে হইত।

দেশে ফিরিয়া পুরা সাহেবী ষ্টাইলে তাহাকে চলিতে হইত। ক্লাব ও পার্টিতে যাইতে হইত। ক্লাব ও পার্টি পোটিকেল ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের সোপান। দেবনাথ ধনী জমিদারপুত্র। ক্লাব ও পার্টিতে নিজের মর্যাদা অনুযায়ী চলিতে হইত। প্রেরিত টাকায় সব সময় কুলাইত না। কাজেই ধারের উপর ধার করিতে হইত। ইহা ছাড়া আর উপায় কি?

নিকট আত্মীয়তা থাকিলেও ইন্দ্র ও দেবনাথের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল না। ইহার কারণ ইন্দ্র পঞ্চক্রোশীতে বিশেষ যাইত না, মাতুল গোষ্ঠীর কাহারও সঙ্গে তাহার হৃদ্যতা জন্মে নাই। তাহা ছাড়া ইন্দ্র জেল খাটিয়াছে বলিয়া রাজভক্ত মাতুল গোষ্ঠীর কেহ তাহার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করিতে উৎসুক ছিলেন না। অন্য কারণ, দেবনাথ ও ইন্দ্রের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য। দেবনাথ বিলাত হইতে ফিরিলে এই ব্যবধান আরও বাড়িয়াছিল। ইন্দ্র শুনিয়াছিল দেবনাথ শুধু সাহেব নয়, মাতাল হইয়াছে।

জিনিসপত্র আনিবার জন্য গাড়ী চলিয়া গেলে ইন্দ্র রাধারাণীকে বলিল—

বৌঠান, আপনারা সাহেব মানুষ, ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেন হয়ত। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, সময় অসময় জ্ঞান নেই। আপনাদের অসুবিধে হবে, আমার ও স্বস্তি থাকবেনা। ভাল করলেন না।

রাধারাণী বলিল—সে আমি বুঝব। আপনার কি হোটেলে থাকা অভ্যাস আছে যে হোটেলে থাকতে চাইছেন? অসুখ করে যাবে।

ইন্দ্র হাসিল তাহার কথা শুনিয়া।

রাধারাণীকে ইন্দ্র বিয়ের সময় দেখিয়াছিল একবার, আর দেখে নাই। তাহার কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। শুধু এইটুকু মনে ছিল দেবনাথদার স্ত্রী অসাধারণ সুন্দরী। এখন সে রাধারাণীকে নূতন করিয়া দেখিল।

বিয়ের সময় সে শুনিয়াছিল রাধারাণী এক দরিদ্র, পরম পণ্ডিত, বৈষ্ণব শিক্ষকের কন্যা, দেবনাথ দা নাকি এক বিয়ে বাড়ীতে রাধারাণীকে দেখিয়া তাহাকে বিয়ে করিবার জন্য খেপিয়া উঠিয়াছিল। পিতা অবর্তমান, মাতার আপত্তি সত্ত্বেও নিজের জিদে বিয়ে হইল। বিয়ের বছর খানেক পরে দেবনাথ দা বিলাত চলিয়া গেল। তারপরের ইতিহাস ইন্দ্র সঠিক জানে না তবে দেবনাথ দার স্বভার চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা গুজব সে রাজনগরে থাকিয়াও শুনিয়াছে। দেখা সাক্ষাৎ কম হয়, খবর রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই।

সেদিনের বালিকা রাধারাণী ও আজকার এই রূপসী ব্যারিষ্টার গৃহিণীর মধ্যে ব্যবধান অনেক।

রাধারাণীর এই আত্মীয়তা কতখানি আন্তরিক সে বুঝিল না কিন্তু আর আপত্তি করা অশোভন হইবে ভাবিয়া সে চুপ করিয়া গেল।

শুধু বলিল, আমি এখানে বিশেষ কাজে এসেছি, দৌড়োদৌড়ি করতে হবে। আপনাদের সত্যি অসুবিধে হবে বৌঠান।

রাধারাণী একটু হাসিয়া বলিল—সুবিধে অসুবিধে বোধের উৎপত্তি কিসে থেকে হয় বলুন তো ঠাকুর পো?

প্রশ্ন শুনিয়া একটু বিস্মিত হইয়া ইন্দ্র রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিল।

একটুখানি বিষন্ন কিন্তু সকৌতুক হাসি রাধারাণীর মুখে।

ইন্দ্র বলিল—আমাকে মাপ করবেন বৌঠান। আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল না তাই—

রাধরাণীর হাসি মিলাইয়া গেল। সে বলিল—পরিচয় এবার হবে।

ইন্দ্র দেবনাথের গৃহে আসিয়া উঠিবার পরদিন সংবাদ পত্রে পড়িল আগামী কাল, অর্থাৎ ১০ই নভেম্বর, মঙ্গলবার, অতি প্রত্যুষে কানাইলালের ফাঁসী হইবে ও কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাহার শেষকৃত্য হইবে। মঙ্গলবার সকালে উঠিয়া সে শশ্মানঘাটের দিকে রওনা হইল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। ইতিমধ্যে সমগ্র অঞ্চল·বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল।

অবশেষে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বাহিত কানাইলালের দেহ আসিয়া পৌঁছিল।

শ্মশানঘাটে খাটিয়া রাখিয়া স্বেচ্ছাসেবকেরদল তাহা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের রচিত পথে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ অগ্রসর হইয়া মৃতের পাদস্পর্শ করিল, ফুলের মালা, বেলপাতা, চন্দন ও গীতা বর্ষণ করিল দেহের উপর। অনেক মহিলা কালী মন্দির হইতে ফুল, বেলপাতা চন্দন ও সিন্দুর আনিয়াছিলেন, অনেকে আতর ও গোলাপ জল আনিয়াছিলেন। তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতের কপালে সিন্দুর ও চন্দন লেপিলেন, গায়ে আতর ও গোলাপ জল দিলেন, পবিত্র নির্মাল্য দিলেন।

নূতন বস্ত্র, ফুলের মালা ও চন্দনে সজ্জিত কানাইলালের মৃতদেহ চন্দন কাঠের চিতায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল, বুকের উপর একখণ্ড গীতা ও হাতে "আশা প্রদীপ"। মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হইল।

বেলা সাড়ে চারিটার পরে কানাইলালের নশ্বর দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, কলসী কলসী গঙ্গা জল চালিয়া চিতা নিভান হইল। বীর দেশ-সেবকের চিতাভস্ম সংগ্রহ করিবার জন্য দলে দলে লোক নির্বাপিত চিতার দিকে অগ্রসর হইল।

সবশেষ হইয়া গেলে ইন্দ্র শ্মশান হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে পড়িল আজ এতক্ষণ পর্যন্ত তাহার স্নান বা আহার হয় নাই, স্নানাহারের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ট্রামে উঠিয়া ভবানীপুরে চাউলপটির কাছে নামিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া ইন্দ্র স্নান করিতে গেল। স্নান সারিয়া ফিরিয়া দেখিল তাহার ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া খাবার জায়গা করা হইয়াছে। একটু পরে গৃহকর্ত্রী স্বয়ং থালায় গরম লুচি ইত্যাদি সাজাইয়া লইয়া আসিল।

ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—কি ব্যাপার বৌঠান? আপনি কখন আমার আসার খবর পেলেন আর এর মধ্যে ব্যবস্থাই বা করলেন কি করে?

রাধারাণী মৃদু হাসিয়া বলিল—যেমন করে ব্যবস্থা করতে হয়। আপনি বসুন, সেই সকালে বেরিয়েছিলেন, কোথাও নিমন্ত্রণ আছে তাও তো বলেন নি—

রাধারাণীর মেয়ে তিন বছরের নান্টি ঘরে আসিল। লুচির থালার দিকে চাহিয়া বলিল—আমি নুচি খাবো। নুচি ভালো, কেক বিচ্ছিরি।

ইন্দ্র রাধারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল—ওর হাতে একখানা লুচি দেব?

রাধারাণী বলিল—আপনি খান, আমি দেব এর পরে।

নান্টি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেল।

দেবনাথ হাইকোর্ট হইতে ফিরিল।

কোর্টের পোষাক ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া সে দোতলার বারান্দায় বসিবার জায়গায় আসিয়া আরামচেয়ারে গা এলাইয়া দিল। বেয়ারা পাশের টিপয়ে এক কাপ কফি রাখিয়া গেল। নান্টি আসিয়া পিতার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইল, মুখখানা একটু ভার ভার। পিতার বাহু স্পর্শ করিয়া অভিযোগের স্বরে সে বলিল—ড্যাডি, কাকা নুচি খেলো, আমি খেলাম না।

পিতা বলিল—নান্টি বাবা চকোলেট খায়, লুচি খায় না। কাকা কোথায়? তাকে ধরে আনো।

নান্টি সোল্লাসে কাকাকে গ্রেপ্তার করিতে গেল।

ইন্দ্র আহার শেষ করিয়া কিছুক্ষণ আগে উকিলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে, নান্টি তাহাকে ধরিতে পারিল না।

উকিলের বাড়ী দূরে, পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। উকিল বাবু কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। ইন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই একটি কথা শুনিয়া বুঝিল কানাইলালের ফাঁসী ও শেষকৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ইহাই ছিল সেদিন সমস্ত কলিকাতা সহরে বাঙ্গালী মহলে একমাত্র আলোচনার বিষয়।

ইন্দ্রকে দেখিয়া উকিল বাবু উঠিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে গেলেন।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—কেসের অবস্থা কেমন বুঝছেন?

উকিলবাবু বলিলেন—দেবানন্দের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ পুলিশ সংগ্রহ করেছে দলের লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করবার জন্য। শাস্তি নিশ্চিত, তবে দ্বীপান্তর কি জেল হবে বলা যায় না। নন্দলাল বাঁড়ুয্যের হত্যা ও ওভারটুনহলে স্যর এনড ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টার পর পুলিশ উঠে পড়ে লেগেছে। এই প্রথম কয়েক ঝাঁক ধরা পড়েছে, আরও কত ধরা পড়বে কে জানে? কাকিনাড়া বোমার ব্যাপারে পুলিশ ধরল কিনা ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্নকে। মোক্ষদা সামধ্যায়ীর মত নিরীহ পণ্ডিতকে ধরেছে ডাকাতির চার্জে। ওঁরা দুজনেই জেল হাজতে পচছেন। মেদিনীপুর বোমার ব্যাপারে গোটা মেদিনীপুর চষে ফেলেছে পুলিশ, নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলালকে পর্যন্ত হাজতে পুরেছে। দুটো নূতন আইন, Newspapers Incitement to Offences Act ও Explosives Act হয়েছে, আবার শুনছি ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট বিল আসছে। দেশের যেখানে যত সমিতি, আখড়া, ক্লাব, পাঠাগার আছে সব বন্ধ করে দেবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা কথায় আছে, যাকে পুলিশ ছোঁবে তার কোন মতে নিষ্কৃতি নাই।

ইন্দ্র বলিল—একবার দেবুদার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

উকিল—অসম্ভব। নরেন গোঁসায়ের হত্যার পরে পুলিশ আসামীদের সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে।

ইন্দ্র অনুনয় করিয়া বলিল—আদালতের মধ্যেই না হয় দেখা করব। যদি আপত্তি হয় কথাবার্তা বলতে চাইনে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চাই।

উকিলবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, তুমি যখন বলছ আমি মিঃ সি. আর দাশের কাছে কথাটা তুলব। তুমি কাল বারোটার পর কোর্টে যেও।

ইন্দ্র বাড়ী ফিরিবার কিছুক্ষণ পরে দেবনাথ ক্লাব হইতে ফিরিল।

ইন্দ্র ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে ক্লাব হইতে দেবনাথ স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরে না। আরও লক্ষ্য করিয়াছে অন্য সময়ে সে কিছু গম্ভীর থাকে কিন্তু ক্লাব হইতে ফিরিবার পরে তাহার বক্তৃতাপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, ভাবাবেগ ও বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রের আবিষ্কার করিতে বিলম্ব হয় নাই যে ইহার কারণ দ্রব্যগুণ।

ইন্দ্রের খোঁজ পড়িল। ইন্দ্র আসিয়া বসিতে দেবনাথ বলিল—তুমি তো শুনতে পাই টেররিষ্ট দলের লোক, আজকের খবর রাখো? ডাটা-গুপ্তা ক্লাবে কানাইলাল দত্তের ক্রিমেশনের বর্ণনা করছিল। রীতিমত পোয়েটিক বর্ণনা।

একটু থামিয়া আবার বলিল—তোমাদের এই বোমাওয়ালাদের ওপর আমার বিশেষ আস্থা নেই, গীতা ও পিকরিক এসিড মিলিয়ে এরা এমন একটা আজব কাল্ট বানিয়েছে যার অর্থ বোঝা কঠিন। বাট থাই মাষ্ট সে কানাই দত্ত ওয়াজ গ্রেট। ডাটা গুপ্তার বর্ণনা শুনে আমারও চোখে জল এসেছিল।

একটু পরে বলিল—স্যর হার্ভে এডামসন টেরিরিষ্টদের কি সম্বন্ধে বলেছেন জানো? "The timid Bengali has been turned into a fanatical Ghazi". কানাইএর দৃষ্টান্ত।

দেবনাথের রাজনৈতিক মতের একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

দেবনাথ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের সভ্য, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির শিষ্য, কিন্তু "মেটা মজলিস" বা কনভেশনিষ্ট কংগ্রেস, অর্থাৎ সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে মডারেটদল যে সভা করেন, তাহাতে যোগ দেয় নাই। গভর্ণমেণ্টের কাছে মডারেট দলের প্রতিপত্তি আছে কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করিতে হইলে নেশনালিষ্ট দলে যোগ দিতে হয়। সরাসরি নেশনালিষ্ট দলে যোগ দিতে সে ভরসা করে নাই। নিরাপদ পন্থা হিসাবে সে দুই নৌকায় পা দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সমাজের শিক্ষিত, সচ্ছল অংশের রাজনৈতিক মত কতকটা এই প্রকার ছিল। তাঁহাদের অনেকে প্রকাশ্যে বিপ্লববাদের সমালোচনা করিতেন, ব্যক্তিগত জীবনে বিপ্লবীদের এড়াইয়া চলিতেন আবার গোপনে মধ্যবর্তীর হাত দিয়া বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করিতেন। বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকের মনে কিছু মোহ ছিল। বিপ্লবীদের সম্পর্কে হয়ত কিছু ভয়ও ছিল।

নৈশ আহার প্রস্তুত হইবার খবর আসিল। দেবনাথ কাপড় বদলাইবার জন্য উঠিল।

দেবনাথ চলিয়া গেলে রাধারাণী আসিল। বলিল, আসুন ঠাকুরপো, আপনার ঘরে খাবার দিতে বলেছি।

তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল—আজ সহজে নিষ্কৃতি পেলেন, আপনার বরাত ভাল। কান্না আরম্ভ হলে আরও অনেকক্ষণ চলত।

ইন্দ্র রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিল। কথাটা শুনিয়া মনে হইল বিদ্রূপ, মুখের ভাবে কিছু বোঝা গেল না।

পরদিন সকালে ইন্দ্র খবরের কাগজ পড়িতেছিল। কানাইলালের শেষকৃত্যের বিস্তৃত বিবরণ ও ছবি বাহির হইয়াছে। এই বিবরণ পড়া হইলে অন্য পৃষ্ঠায় দেখিল সংবাদ দিতেছে তুর্কীতে এনভার বের নেতৃত্বে ইয়ং তুর্ক পার্টির জয়লাভ। আরও সংবাদ দিয়াছে দক্ষিণ 'আফ্রিকায় ভারতীয় নেতা মি. এম. কে. গান্ধীকে কয়েদীর পোষাকে রাজপথে হাঁটাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রের মনে পড়িল মাসখানেক আগে মি. গান্ধীর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ ও জেলখানায় তাঁহার খোয়া ভাঙ্গিবার সংবাদ কাগজ পড়িয়াছিল।

দেবনাথ হাইকোর্টে বাহির হইবার পরে ইন্দ্র আহার শেষ করিয়া আলিপুর আদালতের দিকে রওনা হইল। আদালতের বাহিরে পুলিশের পাহারার কড়াকড়ি দেখিয়া সে ভাবিতে লাগিল কি ভাবে দেবানন্দের উকিলকে তাহার আসিবার সংবাদ পাঠাইবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তাঁহাকে প্রাঙ্গনের একাংশে অন্য কয়েকজন উকিলের সঙ্গে আলাপরত দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাছে গেল।

ইন্দ্রকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—বীচক্রফট্ সাহেব অসুস্থ, কেস আজ হবে না।

ইন্দ্র নিরাশ হইল।

মোকদ্দমার সম্বন্ধে বাকী প্রয়োজনীয় কথাবার্তার শেষ সে বলিল,—আমি আজ দেশে ফিরছি। দু'একদিনের মধ্যে বাকী টাকা পাঠিয়ে দেব।

উকিলবাবু জানাইলেন দুই একদিন থাকিয়া গেলে হয়ত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ইন্দ্র বলিল—বাড়ীতে কাজ আছে, আর অপেক্ষা করা চলে না।

কিছুদূর হাঁটিয়া ইন্দ্র বাড়ী ফিরিবার জন্য ট্রামে উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল দেবুদা তাহাদের জীবন হইতে কতদূরে সরিয়া গিয়াছেন এইবার যেন সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিল। হয়ত তাহার দ্বীপান্তর হইবে। কালাপানি পার হইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে সেলুলর জেলে সে আটক থাকিবে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকিবে না সুদীর্ঘকাল। শাস্তি হিসাবে অনভ্যস্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, কত অত্যাচার সহিতে হইবে। হয়ত কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, অকাল বার্দ্ধক্য তাহাকে গ্রাস করিবে। তখন কি তাহার মনের তেজ, চরিত্রের দৃঢ়তা, দেশের স্বাধীনতার সাধনায় তাহার একাগ্র নিষ্ঠা অটুট থাকিবে ? যদি আর সে ফিরিয়া না আসিতে পারে ? দেশের মাটি, দেশের বাতাসের স্পর্শ পাইবার জন্য হাহাকার করিতে করিতে তাহার জীবন দীপ যদি ঐ নরকেই নিভিয়া যায় ?

ইন্দ্রের দুই চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া সে সোজা হইয়া বসিল। কেন এই সব অশুভ চিন্তা করিতেছে সে ? নিজে এত ভাঙ্গিয়া পড়িলে বাড়ী ফিরিয়া লক্ষ্মীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, দেবুদার পিতামাতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ?

প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষপত্র কিনিবার জন্য সে বাড়ী না গিয়া ট্রাম হইতে নামিল। কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া সে দরজার কাছে পৌঁছিয়া দাঁড়াইল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, একখানি কুশন দেওয়া নীচু বেতের চেয়ারে রাধারাণী চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ইন্দ্রের সাড়া পাইয়া রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—আপনার এত দেরি ঠাকুর পো ? এত জিনিস কিনলেন, বাড়ী যাবেন বুঝি ?

ইন্দ্র বলিল—আজ রাত্রের গাড়ীতে চলে যাব বৌঠান।

রাধারাণী—এখানকার কাজ হয়ে গেছে ? আর দু'একদিন থাকা বুঝি সম্ভব নয় ? আচ্ছা জিজ্ঞেস করি, আপনি এলেন বৌকে নিয়ে এলেন না কেন ? তাহলে ফেরবার এত তাড়া থাকত না।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল,—সে কথা তো ভাবিনি বৌঠান, এসেছিলাম কাজের জন্য, কিন্তু তাকে আনলে আপনাদের সাহেব বাড়ীতে তাকে নিয়ে বিপদে পড়তেন। তার নানা রকম আচার বিচার আছে।

রাধারাণী—তাতে কিছু অসুবিধে হত না। দেখতেন আমরা দু'বোনে বেশ মানিয়ে চলতাম।

ইন্দ্র বলিল—বেশ, এরপর যে বার আসব তাকে নিয়ে আসব।

রাধারাণী বলিল—আপনার জিনিসগুলো নামিয়ে রাখুন, আমি এসে গুছিয়ে দিচ্ছি। এখনই আসছি।

সে চলিয়া গেল। তিন চার মিনিটের মধ্যে থালায় সন্দেশ ও ফল সাজাইয়া থালা হাতে লইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

বলিল—আপনি বিকেলে কিছু খাননি, খেয়ে নিন। আমি ততক্ষণ আপনার জিনিস গুছিয়ে দিই।

ইন্দ্রবলিল—নান্টি কোথা?

রাধারাণী—সে আয়ার কাছে।

ইন্দ্র—দেবনাথ দা কি ক্লাবে গেছেন? কখন ফিরবেন?

রাধারাণী চট করিয়া জবাব দিল না। কাগজের প্যাকিং খুলিয়া জিনিষপত্র বাহির করিয়া খাটের উপর রাখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল—তিনি আজ রাত্রে বাড়ী আসবেন না, মানে শেষ রাত্রে আসবেন। পার্টিতে গেছেন।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাধারাণী কাজ করিতে করিতে নিম্নস্বরে বলিল—আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে ঠাকুরপো? কয়েক দিন থেকে চলে আসব।

প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—আপনি রাজনগরে যেতে চান বড় আনন্দের কথা বৌঠান। তবে এখন নয়। আমি দেবনাথ দাকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করব। নিজে এসে নিয়ে যাব আপনাকে।

রাধারাণী মুখ ফিরাইয়া কাজ করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। ইন্দ্র বলিল—আপনি কি রাগ করলেন?

রাধারাণী ইন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল, বলিল—রাগ

করব কেন ঠাকুরপো? আপনি এই জবাব দেবেন আমি জানতাম। আপনাকে ও কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আপনি তো সব কথা জানেন না ঠাকুরপো, আর দু'চার দিন এখানে থাকলে জানতে পারতেন। বুঝতে পারতেন হঠাৎ কেন ওকথা আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে।

আর কোন কথা হইল না। দেবনাথের গার্হস্থ্য জীবনের একটা দিকের পরিচয় রাধারাণীর ব্যবহারে যেন পরিষ্কার হইল ইন্দ্রের কাছে। রাধারাণীর প্রতি সে গভীর সহানুভূতি বোধ করিল।

দেবনাথের সঙ্গে দেখা হইল না। যাইবার সময়ে রাধারাণীর কাছে বিদায় লইয়া ইন্দ্র বলিল—বৌঠান, আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা থাকলেও চেনা ছিল না এতদিন। যাবার সময় মনে হচ্ছে চেনা হয়ে জীবনের দুঃখ আরও একটু বাড়ল।

রাধারাণী ম্লান হাসিয়া বলিল—আপনার দুঃখ বাড়বে কেন ঠাকুর পো? ভগবান আপনার জীবন সুখময় করুন।

৩

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ইন্দ্র শুনিল তাহার অনুপস্থিতিতে সেবকাশ্রম তল্লাস হইয়াছে। আদিনাথ ফিরিয়াছে সংবাদ পাইয়া তল্লাসীর বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য সে তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইল।

আদিনাথ সেবকাশ্রমের শ্রেষ্ঠ উৎসাহী কর্মী, ইন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

আদিনাথ রাজনগরের লোক নয়, তাহার বাড়ী তারাপুরে।

উত্তরে লাল মাটির দেশ, দক্ষিণে বিশাল গজারির বিল, মাঝখানে খিয়ের অঞ্চল।

খট্‌খটে, পাংাস মাটির দেশ এই খিয়ের।

বেতের দুর্ভেদ্য বন নাই, আগাছার জঙ্গল নাই, মাঠে মাঠে নানা শস্যের বিচিত্র সমারোহ নাই। দিগন্ত বিস্তৃত নেড়া মাঠে কেবল বড় বড় তাল গাছ, বিলান, দমকা বাতাসে সোঁ সোঁ শব্দ করে। মাঝে মাঝে খেজুর গাছের ঝোপ, এদিকে ওদিকে দশ বিশটা বাবলা গাছ জংলী কুল গাছের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এই খিয়ের অঞ্চলের এক কোণে তারাপুর গ্রাম। দক্ষিণে ভাদুই নদী খিয়ের অঞ্চলের বুক চিরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গজারির বিলে পড়িয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে রাণীর জাঙ্গাল। রাণীর জাঙ্গাল নাকি নবাবী আমলে ছিল সওয়ার চলিবার উঁচু সড়ক, যাহা রাণী ভবানী তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এখন সড়ক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জাঙ্গাল হইয়াছে জঙ্গল।

মাতুলের সম্পত্তি পাইয়া আদিনাথের পিতা দীননাথের পিতামহ পঞ্চক্রোশীর পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া তারাপুরে মাতুলগৃহে বাস করিতে আসেন।

স্ত্রী শরৎসুন্দরী, প্রায় কুড়ি বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রঘুনাথ, তিন পুত্র ব্রজনাথ, আদিনাথ ও সোমনাথ এবং কন্যা মানদাকে লইয়া দীননাথের সংসার। খিয়েরের জোত খামার হইতে যে আয় হয় তাহাতে সংসার সচ্ছলে চলিয়া যায়। দীননাথ নিজে নিষ্ঠাবান, ধার্মিক লোক। গৃহ দেবতা শ্রীগোবিন্দজীর পূজা ও বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দিনের বেশীর ভাগ সময় তাঁহার কাটে। বিষয় কর্ম যতটুকু করা আবশ্যক তাহার বেশী সংসারের আর কোন ব্যাপারে থাকেন না, সকল কাজের ভার গৃহকর্ত্রী শরৎসুন্দরীর উপর। শান্ত প্রকৃতি, সত্যনিষ্ঠা ও উদার স্বভাবের জন্য দীননাথ গ্রামের লোকের শ্রদ্ধার পাত্র।

রঘুনাথের দুই বৎসর বয়সের সময় তাহার মাতার মৃত্যু হয়। শরৎসুন্দরী তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। দীননাথ ও তাঁহার স্ত্রীর অতিরিক্ত আদরে বাল্যে রঘুনাথ অতিশয় একগুঁয়ে স্বভাবের ছিল। বড় হইয়া স্বদেশী যুগের প্রথম দিকে সে ব্যায়াম চর্চার আখড়া ও ভলান্টিয়ার দল গড়িয়াছিল গ্রামে। অনেক বুঝাইয়া দীননাথ তাহাকে পঞ্চক্রোশী হাইস্কুলে পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া সে সহরে পড়িতে গেল। ছুটিতে বাড়ী আসিলে পরিবারের সকলে তাহার পরিবর্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শরৎসুন্দরী দেখিলেন রঘুনাথের ধর্মে মতি হইয়াছে, গীতা ও চণ্ডী পাঠ করে, লুকাইয়া ধ্যানধারণা করে। দীননাথ স্নেহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার এই পরিবর্তনে আনন্দিত হইলেন। ইহার পর রঘুনাথ যখন জানাইল সে আর পড়িবে না, পঞ্চক্রোশী স্কুলে চাকুরী করিবে, দুঃখিত হইলেও তিনি বিশেষ আপত্তি করিলেন না।

রঘুনাথ চাকুরি করিতে লাগিল। শরৎসুন্দরী দেবরের বিবাহের কথা পাড়িলেন। রঘুনাথ বিবাহ করিতে রাজি হইল না। ভ্রাতৃজায়াকে বলিল—আর দু'চার বছর পরে ব্রজনাথের বিয়ে দিও, তোমার সাহায্য করার মানুষ পাবে বৌদি।

দীননাথের দ্বিতীয় পুত্র আদিনাথ তাহার কাছে থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে মানদার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল রাজনগরের স্কুলের হেডমাষ্টার রাজেনবাবুর ছেলে রাঘবের সঙ্গে।

দীননাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজনাথ অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। রঘুনাথ যখন চাকুরি করিতেছিল সে একে একে সকল পরীক্ষা খুব ভালভাবে পাশ করিয়া কলিকাতার এক কলেজে চাকুরি পাইল। বাসা করিয়া সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোমনাথকে নিজের কাছে রাখিয়া পড়াইতে লাগিল। শরৎসুন্দরী ছেলের বিবাহের কথা তুলিলেন। ব্রজনাথ বলিল—কাকা বিয়ে করলেন না। আগে তাঁর মত করাও মা।

দীননাথের বয়স হইয়াছিল। বছর দুই হইল তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসাপত্রে সুফল পাইলেন না। ক্রমে তিনি প্রায় অন্ধ হইলেন, দিনের আলোতেও সব জিনিস ঝাপসা দেখেন। অন্ধ দীননাথ মনকে বুঝাইলেন তাঁহার অন্ধত্ব গোবিন্দজীর দান। গোবিন্দজীর চিন্তায় তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

এদিকে দীননাথের শান্তির সংসারে দুঃখ ও অশান্তির ছায়া নামিল।

এক ছুটি উপলক্ষে রঘুনাথ ও আদিনাথ বাড়ী আসিয়াছে। ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে তবু রঘুনাথ যেন অতিশয় ব্যস্ত। প্রায়ই তাহার কাছে অপরিচিত ছেলেরা আসে, তাহাদের লইয়া অনেক পরামর্শ হয়, আলোচনা হয়। দেবরের অনুরোধে শরৎসুন্দরীকে ইহাদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। এত অপরিচিত ছেলের আনাগোনায় শরৎসুন্দরী একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া উত্তর দেয়—এরা আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে ধর্মালোচনা করে।

শরৎসুন্দরীর বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিশেষ কিছু আর বলেন না। ইতিমধ্যে জামাই, পুলিশের দারোগা রাঘব, আসিয়া কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ীতে কাটাইয়া

গেল। শরৎসুন্দরী লক্ষ্য করিলেন জামাই আসিবার পরে রঘুনাথের কাছে ছেলেদের ধর্মালোচনা করিতে আসা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। পুলিশ দীননাথের বাড়ী তল্লাস করিয়া রঘুনাথকে গ্রেপ্তার করিল। কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবার সময় দীননাথ কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রাতাকে স্পর্শ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দারোগা তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। দারোগা ধাক্কা দিলে অন্ধ বৃদ্ধ টাল সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। শরৎসুন্দরী দেবরের হাত ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন, অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় দারোগা তাঁহাকে ধমকাইল। স্বামীকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া তিনি দেবরের হাত ছাড়িয়া দিয়া দৌড়াইয়া স্বামীর কাছে গিয়া তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। বালক সোমনাথ পিতাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া একখানি ইট তুলিয়াছিল দারোগাকে মারিবার জন্য। পুলিশের জমাদারের হাতের প্রচণ্ড এক চড় খাইয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

রঘুনাথকে লইয়া দারোগা যখন সদলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তায় পড়িল আদিনাথ তখন বাড়ীতে ফিরিতেছে। সে খিয়েরে গিয়াছিল জোতের ধানের ব্যবস্থা করিতে। তাহাকে দেখিয়া দারোগা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—এর পর তোমার পালা, তৈরী থেকো বাপু।

ইহার মাসখানেক পরে দীননাথের মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধ শান্তি মিটিবার পরে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আদিনাথ হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করিল।

নানা জায়গায় ঘুরিয়া শেষে রাজনগরে আসিয়া ইন্দ্রের সেবকাশ্রমে যোগদান করিল সে। সেবকাশ্রমের কথা সে তাহার দিদি মানদার মুখে শুনিয়াছিল। মানদা পত্র লিখিয়া আদিনাথের রাজনগরে আসিবার কথা মাতাকে জানাইল।

ইন্দ্র ফিরিয়াছে সংবাদ পাইয়া আদিনাথ আসিল। তল্লাসীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়া সে বলিল—আমাকে থানায় সমস্ত দিন আটক রেখে জেরা করল। সন্ধ্যার সময় ছাড়া পেলাম। তবে দারোগা বাবু লোকটি ভাল। পেটভরে মেঠাই খাইয়েছে। তার মেজাজ প্রসন্ন দেখে বললাম—মশাই, আর সব বইটই না-হয় নিয়ে এলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলো ও ছবি দু'খানা কেন এনেছেন?

দারোগা বলিল—ছবি, বই সব সদরে পাঠাব। আপনারা বলেন ঐ লোকটি সন্ন্যাসী ছিলেন। বাজে কথা মশাই। সন্ন্যাসীর পোষাক ওঁর ছদ্মবেশ ছিল, আসলে উনি ছিলেন বোমাওয়ালাদের গুরু। এতদিন বেঁচে থাকলে জেলে ঘানি টানতে হত।

ইন্দ্র আদিনাথের বিবরণ শুনিয়া হাসিল। বলিল—অসম্ভব নয় আদি। বুদ্ধদেব আজ বেঁচে থাকলে তাঁকেও হয়ত সিডিশানের দায়ে চালান দেয়া হত নূতন ধর্মমত প্রচার করে দেশে রিভোল্যুশনের বীজ ছড়াবার অভিযোগে।

আদিনাথ বলিল—সেবকাশ্রম তল্লাস হওয়াতে গাঁয়ের কোন কোন লোকের আনন্দ হয়েছে। আমার কি মনে হয় জানেন? ঐ সয়তান বটুকটা এর পেছনে আছে। তল্লাসী হবার ক'দিন আগে সে ঘন ঘন আসত, কে কি বলে, কি করে, ওয়াচ করত। কিন্তু বটুক নিমিত্ত মাত্র, আসল ব্যক্তি—

আদিনাথ হঠাৎ থামিতে ইন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কার কথা বলছ? রাঘব বাবুর কথা?

আদিনাথ মাথা হেঁট করিল। ভগ্নীপতি পুলিশের দারোগা রাঘব জবরদস্ত, এন্টি-স্বদেশী পুলিশ কর্মচারী বলিয়া ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

ইন্দ্র বলিল—তল্লাসীর পরে আশ্রমের ছেলেরা কি বলছে?

আদিনাথ—জন দুই ছেলে খুব ভড়কে গেছে, হয়ত পালিয়ে যাবে। আর সবাই ঠিক আছে।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ইন্দ্র আদিনাথকে লইয়া অন্দরে ঢুকিল।

ইন্দ্রের গৃহে আদিনাথের অবারিত দ্বার। লক্ষ্মীকে সে বৌদি বলিয়া ডাকে। লক্ষ্মী প্রথমে এই অনাত্মীয় যুবকের সম্মুখে বাহির হইত না। কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি তাহার গভীর আনুগত্যের পরিচয় পাইয়া ও ইন্দ্রের মুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়া সে সঙ্কোচ দূর করিয়া নিজে হইতে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ইন্দ্রের স্ত্রী ও দেবানন্দের ভগ্নী বলিয়া লক্ষ্মীকে আদিনাথ গুরুজনের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। যথেষ্ট আন্তরিকতা জন্মিলেও ইন্দ্রের সঙ্গে ছাড়া সে কখনও একা লক্ষ্মীর সম্মুখে আসিত না।

অন্দরে আসিয়া ইন্দ্র লক্ষ্মীকে বলিল—আদিকে কিছু খেতে দাও। আমরা এখনই বেরুব।

লক্ষ্মী বলিল—বাবার কাছে একবার যাওয়া দরকার। তোমার ফেরবার খবর পেয়ে তিনি হয়ত অপেক্ষা করছেন।

ইন্দ্র বলিল—আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

আদিনাথকে খাইতে দিয়া লক্ষ্মী বলিল—তুমি ছিলে না, পুলিশকে নিয়ে বড় হাঙ্গামায় পড়েছিলেন আদি ঠাকুরপো।

আদিনাথ মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিল—পুলিশের হাঙ্গামার অনেক অভিজ্ঞতা আছে বৌদি, সেদিনকার হাঙ্গামা নূতন অভিজ্ঞতা নয়। কাকাবাবুকে গ্রেপ্তার করতে এসে তল্লাসীর নামে আমাদের বাড়ীতে পুলিশ যে অত্যাচার করেছিল, আমার বৃদ্ধ, অন্ধ বাবাকে, মাকে পর্যন্ত যে ভাবে লাঞ্ছিত করেছিল সে কথা কোনদিন ভুলব না। আর ভুলব না এইসব নীচমনা অত্যাচারী আমারই দেশের লোক। কাকাবাবুর জন্য দুশ্চিন্তা ও মনের গ্লানিতে বাবা মারা গেলেন। পুলিশ বাড়ী তল্লাস করেছিল, ডাকাতির অভিযোগে কাকাবাবুকে গ্রেপ্তার করেছিল, এজন্য ভয়ে গ্রামের লোক শবদাহ করতে আসতে চায়নি, দেশের লোকের পুলিসের ভয় এতই বেশী। দেখেশুনে মন থেকে তাই পুলিশের হাঙ্গামার ভয় দূর করেছি বৌদি।

আদিনাথের পরিবারের এই দুঃখের ইতিহাস ইন্দ্রের কাছে লক্ষ্মী আগে শুনিয়াছে। সে আর কোন কথা বলিল না।

আদিনাথের খাওয়া শেষ হইলে ইন্দ্র ও সে পথে বাহির হইল। আদিনাথ সেবকাশ্রমের পথ ধরিল, ইন্দ্র টোল পাড়ায় শ্বশুরালয়ের দিকে চলিল।

জীবানন্দ ইন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

জীবানন্দের বয়স এখন দশ বৎসর বেশী দেখায়, শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পুত্র বোমার মামলার আসামী, ভাগ্যের এই পরিহাসে তাঁহার প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম সব গিয়াছে। লোক চক্ষুর আড়ালে থাকিতে পারিলে তিনি যেন বাঁচিয়া যান। কাহারও সহিত বিশেষ মিশেন না। পূজা অর্চনায় অনেক সময় যায়, বাকী সময় শাস্ত্র চর্চায় কাটাইয়া দেন।

ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলে খবর পাইয়া ত্রিনয়নী সেখানে আসিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন,—দেবুর মামলার অবস্থার কথা কিছু শুনলে? উকিল কি বলেন?

ইন্দ্র উকিলের সঙ্গে আলোচনার মর্ম তাঁহাকে জানাইল, শুধু শাস্তি সম্বন্ধে উকিলের কথার উল্লেখ করিল না। দেবানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টায় কথাও বলিল।

শুনিয়া ত্রিনয়নী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। জীবানন্দ তাঁহার গমনপথের দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন। তারপর ইন্দ্রের সেবকাশ্রম তল্লাসীর কথা তুলিয়া বলিলেন—যতটা পার তোমাকে সাবধান হয়ে চলতে হবে, বাবা। অনেকের ভালমন্দর ভার রয়েছে তোমার ওপর। আমার শরীরের অবস্থা চোখে দেখছ। ভগবানের ইচ্ছা কি জানিনে। ছোটমেয়েটার বিয়ের কিছুই স্থির করতে পারছিনে।

ইন্দ্র আশ্বাস দিয়া বলিল—এত ভাবনার কি আছে? আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি। তেমন ভাল ছেলের সন্ধান পাইনি বলে আপনাকে জানাইনি।

ইন্দ্র উঠিয়া ভিতরে গেল। ত্রিনয়নীর সঙ্গে দেবানন্দের সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য আশ্বাস দিয়া সে বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিল।

ফটকে কনিষ্ঠ শ্যালক উমানন্দের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—আমি যে আপনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম জামাইবাবু। দিদি বললে আপনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—আমার খোঁজ কেন আনন্দ?

আনন্দ—দাদা কবে বাড়ী আসবে জামাইবাবু? তাকে কি ছেড়ে দিল না?

ইন্দ্র তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল—দাদা আসবে বইকি আনন্দ, ছাড়া পেলেই আসবে।

পথে চলিতে চলিতে উমানন্দ বলিল—কাল রাতে কি কাণ্ড হয়েছিল জানেন জামাইবাবু?

ইন্দ্র—কি কাণ্ড হয়েছিল ?

উমানন্দ—হেড মাষ্টার মশায়ের ছেলের বৌ বাড়ী থেকে পালিয়ে মার কাছে এসেছিল। তাকে নাকি খুব মেরেছিল। মার কাছে কাঁদছিল আর পিঠে খড়মের দাগ দেখাচ্ছিল, ছোড়দি দেখেছে।

পথের ডানদিকে শশী পোদ্দারের পতিত ভিটা। উঠানে একটা গাব গাছ চোখে পড়ে। আলাপের বিষয় পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র বলিল—আনন্দ, শশী পোদ্দারের গাব গাছে গাব পাকেনি এখনও ? তুমি পাকা গাব খেয়েছ ?

উমানন্দ হাসিয়া বলিল—অনেক খেয়েছি। আমাকে ঠকাচ্ছেন আপনি। এখন বুঝি গাব পাকে ? দেখছেন না গাছে নূতন পাতা হয়েছে কত ?

পাকা গাবের পরে কামরাঙ্গা, পাকা বেত ফল, নোনা ফল, বন কাঁঠালের গল্প চলিতে লাগিল। গল্প শেষ হইবার আগে তাহারা বাড়ী পৌঁছিল।

রাজনগর ও তারাপুরের কথা উপরে বলা হইয়াছে, সে সময়ে রাজনগর ও তারাপুরের মত অবস্থা বাংলার গ্রামে গ্রামে।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। লর্ড মিণ্টোর গভর্ণমেণ্ট এনার্কিষ্ট উপদ্রব দমনের জন্য নূতন নূতন দমনমূলক আইনের শৃঙ্খলে দেশবাসীকে বাঁধিতেছেন, তবু আশানুরূপ ফল হইতেছে না। খানাতল্লাসী ও প্রতিরাত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গৃহে পুলিশের হাঁকডাকের ব্যবস্থায় লোকে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। গ্রামোফন রেকর্ডে ও রঙ্গালয়ে স্বদেশী গান পুলিশের আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হঠাৎ একদিন দেশের লোক চমকিত হইয়া শুনিল কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনী কুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ভূপেশচন্দ্র নাগ, শচীন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নয় জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সেদিন সকালের দিকে ইন্দ্র বসিয়া নেতাদের এই নির্বাসনের কথা ভাবিতেছিল। একজন মাতব্বর প্রজা কাছারীতে আসিল। সে সংবাদ দিল

আগের দিন রাত্রে গঞ্জে স্বদেশী ডাকাইতি হইয়াছে। নায়েব আসিয়া ইন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইতে ইন্দ্র তাহাকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া পাঠাইল।

বৈঠকখানার বারান্দায় ইন্দ্র মোড়া পাতিয়া বসিয়াছিল, মাতব্বর ইসমাইল গায়েন আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

ইসমাইল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, বলিষ্ঠ গঠনের প্রৌঢ় মানুষ, ঘন কাঁচা পাকা দাড়ি উদর পর্যন্ত নামিয়াছে। আগে দাঙ্গাবাজ ও মামলাবাজ বলিয়া ইসমাইলের কুখ্যাতি ছিল। সাতদিনের মধ্যে জোয়ান দুই ছেলে কলেরায় মরিয়া যাইবার পরে এখন নাকি সে ভাল হইয়াছে, ধর্মেকর্মে মতি হইয়াছে।

ইন্দ্র বলিল—ইসমাইল, কি ডাকাতির কথা বলছিলে কাছারীতে?

ইসমাইল বৈঠকখানার সিঁড়িতে ভাল করিয়া বসিল। বলিল—হুজুর, কাল সাঁজের ওক্তে গঞ্জের হারাণ কুণ্ডুর গদিতে এক জব্বর ডাকাতি হইছে। সকলে কইছে স্বদেশী ডাকাতের কাম এডা।

ইন্দ্র—স্বদেশী ডাকাত কি রকম?

ইসমাইল—নিজের চোখে দেখা লয়, শোনা বেত্তান্ত হুজুর। যা শোনছি তাই কইতিছি।

ইসমাইলের সুদীর্ঘ, সালংকৃত বর্ণনা হইতে ইন্দ্র জানিতে পারিলে আটজন যুবক হাফপ্যাণ্ট ও সার্ট পরিয়া, মুখে রুমাল বাঁধিয়া বন্দুক, পিস্তল ও ছোরা এবং ইলেকটিরি মশাল বা টর্চ লইয়া গদিতে হানা দিয়াছিল। ভয় দেখাইয়া চাবি আদায় করিয়া তাহারা নগদ ৪৩০০৲ টাকা সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া লয়। সিন্দুক হইতে টাকা লইয়া তাহারা হারাণ কুণ্ডুর অন্দরে প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলে—মাঠাকুরুণরা, আমরা স্বদেশী ডাকাত। যার গায়ে যে সোনার গহনা আছে খুলে একজন বেরিয়ে এসে আমাদের দিয়ে যান। চিৎকার করলে কি গহনা না দিলে কুণ্ডু মশাই ও পরাণকে গুলি করে মেরে ফেলব। পরাণ হারাণ কুণ্ডুর ছেলে।

গহনা দিতে দেরি হওয়ায় একজন বন্দুকের আওয়াজ করিল। মেয়েদের মধ্যে একজন কাপড়ে বাঁধা ছোট একটা পুঁটুলি উঠানে ছুঁড়িয়া দিল। পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া তাহারা হুইসিল বাজাইল। একসঙ্গে তিনচারিটা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া তাহারা মার্চ করিয়া চলিয়া গেল। আওয়াজ শুনিয়া যে

দুইচারিজন লোক গদির দিকে আসিতেছিল ডাকাতদিগকে দেখিয়া তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

ইস্‌মাইলের বর্ণনা শেষ হইলে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—পুলিশ ডাকাতদের কাউকে ধরতে পারেনি ?

ইসমাইল আকর্ণ বিস্তৃত হাসিয়া বলিল,—পুলিশ বাজে চোর ছ্যাঁচড় ধরতি পারে না আর স্বদেশী ডাকাত ধরবি ? স্বদেশী ডাকাত পুলিশের মামদো ভূত হুজুর। ও হালাদের জানের ডর আমাগো চায়্যা বেশী। হারাণ কুণ্ডুর টাকা গ্যালো ত পুলিশের কি লোকসানডা হইলো ? ক্যান সে পেস্তল বন্দুকের সামনি আগায়্যা জানডা দিবি ?

ইসমাইল স্বদেশী ডাকাতের গল্প শেষ করিয়া কাছারীতে নিজের কাজে চলিয়া গেল। ইন্দ্র ভাবিল স্বদেশী ডাকাত ত পলাইল, এইবার এ অঞ্চলে নূতন করিয়া খানা তল্লাসী ও গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িবে।

কয়েকদিন পরে সংবাদপত্রে খবর বাহির হইল নূতন আইনের বলে গভর্ণমেণ্ট বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, মৈমনসিংয়ের সুহৃদ ও সাধনা সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও কলিকাতার যুবক সমিতিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খবর দিয়া কাগজ লিখিল—"এই সকল সমিতির উৎসাহী সভ্যরা দুর্ভিক্ষে সাহায্য, লোকের বিপদ আপদে ও রোগে সেবা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যায়াম চর্চা করিত। স্থানীয় কর্মচারীদের মিথ্যা রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া সরকার সকল সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলেন।"

সংবাদ পড়িয়া ইন্দ্র সেবকাশ্রমের ভবিষ্যতের কথা ভাবিল। ভাবিল রাঘব দারোগা ইহার পিছনে লাগিয়াছে, আর কতদিন ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে কে জানে।

সন্ধ্যার পরে সেবকাশ্রমের পাঠাগারে এই নূতন আদেশ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। ইন্দ্র ছাড়া রজনী ডাক্তার, শরৎ পণ্ডিত, মুকুন্দ সরকার, রাজেন বাবু, আদিনাথ ও সেবক সমিতির কয়েকজন কর্মী উপস্থিত ছিল।

রজনী ডাক্তার সেবকাশ্রমের ডাক্তার। শরৎ পণ্ডিত আশ্রমে কথকতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। মুকুন্দ সরকার গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন,

অবসর লইয়াছেন। ইন্দ্রের প্রতি আকর্ষণের জন্য ও শরৎ পণ্ডিতের কথকতা শুনিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে সেবকাশ্রমে আসেন।

মুকুন্দ সরকার রাজেন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলতেছিলেন—মশাই, কাগজে পড়েছেন খাস লণ্ডন সহরে কুঞ্জলাল ভট্টাচার্য নামে এক বাঙ্গালী ছোকরা ইণ্ডিয়া অফিসের লী ওয়ার্ণার সাহেবকে ঠেঙ্গিয়েছে? সাহেব নাকি তাকে অপমান করেছিল।

কথাটা বলিয়া চোখ বুঁজিয়া মুকুন্দ সরকার স্বগত বলিলেন—শ্যামা মা, কালে কালে দেখব কত! মুকুন্দ সরকারের কালী ভক্ত বলিয়া খ্যাতি ছিল।

শরৎ পণ্ডিত বলিলেন—অতি সুসংবাদ পোষ্টাল মাষ্টার।

(সুর করিয়া) কালে কালে দেখব কত
মশার ঘায়ে হস্তী হত।

রাজেন বাবু বিলাতে মুশ্লিম ডেপুটেশনের কথা তুলিলেন। বলিলেন—ইন্দ্র, লর্ড মর্লের কাছে আগাখাঁ ও আমির আলির ডেপুটেশনের ফল কি হয়েছে জানো? লর্ড মিণ্টো মুসলমান নেতাদের ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের পোলিটিকেল ইম্পর্টান্স অনুসারে স্পেশাল রাইটস পাওয়া উচিত। এই ইঙ্গিত পেয়ে নূতন রিফর্মসে তাঁদের যাতে আলাদা ইলেকটরেট দেওয়া হয় সেই দাবি তাঁরা করেছেন মর্লের কাছে। মর্লে কি উত্তর দিয়েছেন কাগজে বেরিয়েছে?

ইন্দ্র উত্তর দিবার আগে মুকুন্দ সরকার বলিলেন—আজ ক'দিন হল এই নিয়ে আলোচনা চলছে মশাই, আর আপনি জানেন না? মর্লে সাহেব বলেছেন—

শরৎ পণ্ডিত—বলেছেন, তথাস্তু বৎসগণ, তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

মুকুন্দ সরকার—কিন্তু এর ফল কি হবে বুঝেছ পণ্ডিত, না শুধুই ফরফর করছ?

শরৎ পণ্ডিত—মশাই, ফলেন পরিচীয়তে
সফরী ফরফরায়তে।

আপনাদের শাসন সংস্কারটি কি বস্তু হবে বলতে পারেন?

রাজেন বাবু—মিণ্টোর কথা বলতে পারিনে তবে "হনেষ্ট" মর্লের হাত থেকে সারবান বস্তু পাওয়া যাবে সকলেই আশা করছেন।

মুকুন্দ সরকার কি বলিতে যাইতেছিলেন রজনী ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন —আপনাদের রাজনৈতিক কচকচি চলুক, আমরা উঠছি। আশ্রমের কাজ আছে। এসো ইন্দ্র।

জীবানন্দ লক্ষ্মীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লক্ষ্মী আসিলে বলিলেন— মা, ইন্দ্রের সেবকাশ্রম তল্লাসীতে আমি বড় ভয় পেয়েছি। আমি বললে ইন্দ্র কিছু মনে করে এই ভেবে বলতে পারিনি, কিন্তু আর না বললে নয়। সেবকাশ্রম বন্ধ করে দিলেই বোধহয় ভাল হয়। নানা জায়গা থেকে ছেলে আসে, তাদের কার মনে কি মতলব আছে কেউ জানে না। এর পরে হয়ত ইন্দ্রকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে। পুলিশের চোখে ও ত একজন দাগী হয়েই আছে। এদিকে গাঁয়েও ওর শত্রু আছে।

লক্ষ্মী মাথা নত করিয়া বলিল—সেবকাশ্রম ওঁর প্রাণ, আশ্রম বন্ধ করলে উনি কি নিয়ে থাকবেন বাবা?

জীবানন্দ উত্তর না দিয়া নিজের মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—সংসারের দিকে চেয়ে ইন্দ্রকে কিছুকাল বাইরের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে, আর কোন উপায় দেখছি না। আর দেরি না করে তোমাকে কথাটা তুলতে হবে ইন্দ্রের কাছে। পারবে না, মা?

লক্ষ্মী তেমনি নতমুখে বলিল—আপনি বলছেন, আমি কথা তুলব।

জীবানন্দ বলিলেন—হাঁ তাই তুলো, মা। আর দেরি করো না।

৪

অনেকদিন পরে ইন্দ্র কলিকাতা হইতে রাধারাণীর এক পত্র পাইল।

তাহাকে রাজনগরে আনিবার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে লিখিয়াছে—ঠাকুরপো, আপনার কথা রাখিতে পারেন নাই। অনেকদিন আপনার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকিয়া শেষে বুঝিলাম আপনি এখানকার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। রাধারাণী বৌঠান নামে আপনার যে কোন আত্মীয়া আছেন, সে যে আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখিয়া অপেক্ষা করিতে পারে তাহা আপনার মনে নাই। একথা কি সত্য নয়? যাক এ সব কথা। আমি

কয়েক দিনের জন্য পঞ্চক্রোশী যাইতেছি আমার বাবাকে দেখিবার জন্য। যদি আপনি জংশন ষ্টেশনে নামাইয়া লইবার ব্যবস্থা করেন দুই এক দিনের জন্য রাজনগরে থাকিয়া যাইবার ইচ্ছা আছে। আপনাকে ও আপনার গৃহলক্ষ্মীকে দেখিবার বড় ইচ্ছা, তাই কথাটা আপনাকে লিখিলাম। আমাদের পরাধীন জীবনে সুযোগ বড় আসে না।

সে আরও কয়েক লাইন লিখিয়াছে। এমন সব কথা লিখিয়াছে যাহা মন বিশেষ বিচলিত না হইলে কেহ বড় লিখে না।

রাধারাণীর চিঠি পাইয়া ইন্দ্র আনন্দিত হইল। একটু বিমর্ষ ভাবও বোধ করিল। বিমর্ষ বোধ করিল এই ভাবিয়া যে এত রূপ, এত গুণ রাধারাণী বৌঠানের কিন্তু সংসারে শান্তি বা তৃপ্তি পাইলেন না তিনি।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে চিঠিখানি পড়িতে দিয়া বলিল—কি করা যায় ভেবে বল।

লক্ষ্মী পড়িতে লাগিল। চিঠির শেষের দিকে আসিয়া সে মুখ তুলিয়া একবার ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিল, তারপর আবার পড়িতে লাগিল।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া উহা ভাঁজ করিয়া পাশে রাখিল। মৃদু, সকৌতুক হাসির সঙ্গে ইন্দ্রকে বলিল—চিঠি পেয়ে তোমার মুখের ভাব একটু বিপন্ন দেখাচ্ছে কেন বলো ত?

তারপর সহজভাবে বলিল—এত ভাববার কি আছে? পঞ্চক্রোশীর রাজবাড়ীর বৌ, সম্পর্কে তোমার গুরুজন। নিজে আসতে চেয়েছেন, আদর করে আনতে হবে। তুমি নিজে জংশন ষ্টেশনে গিয়ে ওঁকে নামিয়ে নিয়ে এস। নায়েব মশাইকে ডেকে সেই ব্যবস্থার কথা বলে দাও।

ইন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমিও এই রকম ভাবছিলাম। একটু চেষ্টা করে দেখ বৌঠানের মনটা যদি কিছু ভালো করে দিতে পার। চিঠি পড়ে মনে হয় উনি অশান্তি ভোগ করছেন।

উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লক্ষ্মীর মনে কি কথার উদয় হইল। সে বলিল—শোন।

ইন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মী হাসি গোপন করিবার জন্য মুখ নত করিয়া জিজ্ঞাসুর স্বরে বলিল—রাধারাণী দিদি দেখতে খুব সুন্দরী, না?

ইন্দ্র লক্ষ্মীর একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মানুষের বাইরের রূপ আমি চোখ দিয়ে দেখি আর মন দিয়ে দেখি মানুষের মনের রূপ। কাজেই আমার মনে যে ছায়া থাকে তা মনের রূপের। বুঝলে ?

লক্ষ্মীর মুখ একটু ম্লান হইল। সে বলিল—আমার হালকা কথার এমন ভারী জবাব দিলে তুমি! আমি কি তোমাকে জানিনে ?

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—জানো বলেই ঠিক জবাবটি দিয়েছি। ভেবে দেখো।

তারপর লক্ষ্মীর মুখের উপরের ছায়াটুকু সরাইয়া ফেলিবার জন্য বলিল, এ সব কথা থাক। আমি জংশন ষ্টেশনে যাবার ব্যবস্থা করছি। বৌঠানকে কোন ঘরে থাকতে দেবে ?

লক্ষ্মী বলিল—চিনির ঘরটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখব।

ইন্দ্র বলিল—আচ্ছা।

সে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাধারাণীর চিঠি পাইবার পরদিন কলিকাতা হইতে উকিলের টেলিগ্রাম আসিল আপীলের রায় বাহির হইয়াছে, দেবানন্দের সাত বৎসর দ্বীপান্তরের দণ্ড হইয়াছে। উকিল বাবু সান্ত্বনা দিয়াছেন সেশন কোর্টের রায়ে দশ বৎসর ছিল, তিন বৎসর কমিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাটিয়া যাইবে।

টেলিগ্রাম পাইয়া ইন্দ্র অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে বারবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল দুইটি কথা—সাত বৎসর! এই এই সাত বৎসর দেবুদার সঙ্গে তাহার দেখা হইবে না। তাহার বাবার শরীরের যে অবস্থা তাঁহার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হইবেনা। এই সাত বৎসরে দেশের লোক হয়ত ভুলিয়া যাইবে দেবানন্দ নামে একটি যুবক তরুণ জীবনের সকল আশা আকাঙ্খা বিসর্জন দিয়া, সংসারের ব্যগ্র, আলিঙ্গনোদ্যত বাহু নির্বিকার, ঔদাসীন্যে অগ্রাহ্য করিয়া দেশের স্বাধীনতা লাভের সাধনায় আপনাকে বলি দিয়াছিল।

কিছুক্ষণ এলোমেলো নানা চিন্তায় ডুবিয়া রহিল সে। তারপর টেলিগ্রামটি হাতে লইয়া টোলপাড়ার দিকে চলিল। ভাবিল দেবুদার বাপ মাকে আগে খবর দিয়া আসি, পরে লক্ষ্মীকে জানাইব।

জীবানন্দ টেলিগ্রাম পড়িয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দ্রের দিকে

চাহিয়া বলিলেন—দেবুর কথা ভেবে মন খারাপ করো না, বাবা। সে জেনে শুনে সিংহের গুহায় এগিয়ে গেছে, জীবন্ত ফেরবার আশা রেখে-যায়নি।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, তাঁহার স্বর একটু উত্তেজিত শুনাইল,—আমার চিন্তা দেবুকে নিয়ে নয়, আমার চিন্তা তোমাকে নিয়ে। দু দু'টো সংসার তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেই হবে তোমাকে।

ইন্দ্র ভাবিল জিজ্ঞাসা করে—কেন নিজেকে বাঁচিয়ে চলব আমি, কিন্তু শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে পারিল না।

জীবানন্দ যেন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—দেবুর অনুপস্থিতিতে তার নাবালক ভাইবোনের দায়িত্ব যে তোমাকে নিতে হবে বাবা, আমি আর ক'দিন আছি।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্র উঠিল। বলিল—আপনি খবরটা দেবেন ভেতরে, আমি বাড়ী যাচ্ছি।

পথে চলিতে চলিতে সে স্থির করিল লক্ষ্মীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিবে, সেখানেই সে খবরটা শুনিবে।

বাড়ী ফিরিয়া সে লক্ষ্মীকে বলিল—ও বেলা একবার টোল পাড়ায় যেও, তোমার মা ডেকেছেন।

লক্ষ্মী পাঁচু ঠাকুরকে রান্নার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিল। ইন্দ্রের কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কি ভাবিয়া পাঁচুকে বিদায় দিয়া সে স্বামীকে বলিল—এদিকে শোন।

ইন্দ্রকে লইয়া সে ঘরে গেল। একটা আসন দেখাইয়া বলিল—বসো। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লক্ষ্মী তাহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

বলিল—দাদার কি খবর এসেছে বলো।

তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রুর ধারা নামিল। ইন্দ্র তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল,—সাত বৎসরের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছে।

সাত বছর দাদাকে দেখতে পাবো না—লক্ষ্মীর কান্না থামিতে চাহে না।

তল্লাসীর ফলে সেবকাশ্রমের বোর্ডিং হইতে দুইটি ছেলে পলাইয়াছিল, বাড়ী

হইতে যাহারা আসিত তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন গরহাজির। ইহাতে না দমিয়া আদিনাথ কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। কয়েকদিন পরে তারাপুর হইতে তাহার মাতার এক পত্র পাইয়া আদিনাথ বিস্মিত হইল। মাতা লিখিয়াছেন ব্রজনাথ ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি কয়েকদিনের মধ্যে রাজনগরে রওনা হইতেছেন মানদাকে দেখিবার জন্য।

চিঠির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আদিনাথ ইন্দ্রকে চিঠি দেখাইল। ইন্দ্র চিঠি খানি বার দুই পড়িয়া হাসিয়া বলিল—চলো তোমার বৌদির কাছে, চিঠির অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আদিনাথকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে আসিয়া ইন্দ্র লক্ষ্মীকে ডাকিল। লক্ষ্মী আসিলে বলিল—এবার আদি পালাচ্ছে রাজনগর থেকে।

লক্ষ্মী বলিল—কি হয়েছে আদি ঠাকুরপো ?

আদিনাথ—কিছু হয়নি বৌদি, আজ এক চিঠি পেলাম তারাপুর থেকে। মা লিখেছেন দাদাকে নিয়ে তিনি এখানে আসছেন।

ইন্দ্র—যেটুকু তিনি লেখেননি সেটুকু আমি বলছি। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মা আসছেন পলাতক ছেলেটিকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ব'লে।

আদিনাথ—আপনি চিঠিখানা পড়ে দেখুন বৌদি, মা কোথায় একথা লিখেছেন।

ইন্দ্র—পড়তে হবে না। চিঠিতে একথা লিখলে ছেলেটি রাজনগর থেকে উধাও হতে পারে এ ভয় কি তাঁর নেই ?

আদিনাথের মাতার চিঠির কথা শুনিয়া লক্ষ্মীর হঠাৎ মনে হইল আদি ঠাকুরপোর মা যদি তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন স্বামীর কাছে সেবকাশ্রম বন্ধ করিয়া দিবার কথা তোলা সহজ হইবে। পিতা তাহাকে স্বামীর কাছে এই কথা তুলিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু লক্ষ্মী এ পর্যন্ত কথা পাড়িবার সুযোগ পায় নাই।

রাধারাণী রাজনগরে আসিল।

ইন্দ্র নিজে ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি একা বৌঠান, নান্টিকে আনলেন না ?

রাধারাণী—নান্টির বাবা তাঁর মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে আসতে দিলেন না।

তারপর একটু হাসিয়া বলিল—আমি তো নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখে জোর করে এলাম।

ইন্দ্র বলিল—জোর আছে তাই জোর করে আসতে পারলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনি এসেছেন, আমি সত্যিই খুশী হয়েছি বৌঠান। আপনি চিঠিতে যে খোঁচাটুকু দিয়েছেন তা গায়ে লাগেনি।

রাধারাণী হাসিল। বলিল—পুরুষ মানুষ, শরীরে কি রাগটুকুও থাকতে নেই?

ইন্দ্র—বড় ঝঞ্ঝাট যাচ্ছে বৌঠান। বাড়ী গিয়ে সব শুনবেন। আর একটা কথা ছিল, আপনার কাছে স্বীকার করা ভাল। দেবনাথ দা আপনাকে আসবার অনুমতি দেবেন কিনা এ সংশয়টুকু মন থেকে দূর করতে পারিনি তাই চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ জানাতে ইতস্তত করছিলাম।

তারপর হাসিয়া বলিল—আপনি এসেছেন এইটে মস্ত বড় জিনিষ, এসব কৈফিয়ৎ তুচ্ছ হয়ে গেছে। রাত জেগে এসেছেন, এবার চলুন।

প্লাটফরমের উপর পাল্কী লইয়া বাহকগণ ও দুইজন পাইক অপেক্ষা করিতেছিল, রাধারাণী পাল্কীতে উঠিয়া বসিলে ইন্দ্রের আদেশে পাল্কী রওনা হইয়া গেল।

দুইদিন রাজনগরে থাকিয়া তৃতীয় দিন রাধারাণী পঞ্চক্রোশী যাত্রা করিল। আর কয়েকটা দিন থাকিবার জন্য ইন্দ্র ও লক্ষ্মী তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিল, রাধারাণী রাজি হইল না।

ইন্দ্রকে সে বলিল—বাবার অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি, এ যাত্রা আর থাকতে পারলাম না ঠাকুরপো।

একটু হাসিয়া বলিল—আপনি এত কাজের মানুষ ঠাকুরপো জানতাম না। লক্ষ্মী ছেলেমানুষ, বাড়ীতে একা। তার ওপর সংসারের ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে থাকেন।

ইন্দ্র এই অভিযোগের উত্তরে একটু হাসিল মাত্র।

সে কি ভাবিল অভিযোগ লক্ষ্মীর নয়, রাধারাণীর নিজের? রাজনগরে আসিয়া রাধারাণী কি লক্ষ্য করিয়াছে ইন্দ্র তাহাকে লক্ষ্মীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া

নিজে সরিয়া থাকিত ? রাধারাণী যে তাহার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে চাহে তাহা কি ইন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিত না ?

ইন্দ্রের হাসি দেখিয়া রাধারাণী একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল তাহার বুক হইতে। হয়ত তাহার মুখ একটু ম্লান হইল।

লক্ষ্মীকে একান্তে ডাকিয়া রাধারাণী বলিল—তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল, সে ইচ্ছে পূর্ণ হল। তোমাকে একটা কথা বলছি, কিছু মনে করো না। ঠাকুরপোকে দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল ওঁর বাইরটা এত সুন্দর কিন্তু মনটা কঠিন। এখানে এসে দেখলাম ওঁর মন কঠিন নয়, কোথায় যেন একটু উদাসীন ভাব রয়েছে ওঁর স্বভাবের মধ্যে। তোমাকে দেখবার, জানবার পর এইটি একটু আশ্চর্য লাগছে। দু'একটা কচি কাচা তোমার কোলে এলে হয়ত এভাব কেটে যাবে।

লক্ষ্মী লজ্জিত মুখে বলিল—আপনি আর ক'টা দিন এখানে থাকুন দিদি।

রাধারাণী বলিল—সে হয় না ভাই। বাবার অসুখ বলে ছুটি পেয়েছি কিন্তু নিজের মেয়েটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি। এই থেকে আমার পরাধীন অবস্থা বুঝতে পার। আর একটা কথা বলি বোন। তোমার সুখ সৌভাগ্য দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে ; প্রাণভরা এই আনন্দ নিয়ে আমি যেতে চাই। আমাকে আর বাধা দিয়ো না।

তাহার কথা শুনিয়া লক্ষ্মী যেন একটু বিচলিত হইল। রাধারাণীকে সে আর বাধা দিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল ঠাকুর মানুষকে নিজের মনের সঙ্গে এমন দ্বন্দ্বেও ফেলেন।

রাধারাণী চলিয়া যাইবার চার পাঁচদিন পরে আদিনাথ মাতা ও ভ্রাতাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিল।

স্থির ছিল তাঁহারা মানদার শ্বশুর রাজেন বাবুর গৃহে উঠিবেন কিন্তু আদিনাথ তাহাতে সম্মত না হইয়া ইন্দ্রের গৃহে তাঁহাদের লইয়া আসিল।

ইন্দ্র সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিল। লক্ষ্মী নিজে বাহিরে আসিয়া শরৎসুন্দরীকে অভ্যর্থনা করিয়া অন্দরে লইয়া গেল।

ব্রজনাথ ইন্দ্র অপেক্ষা কিছু বড়। পাতলা, মার্জিত, সুশ্রী চেহারা। পণ্ডিত লোক। তাহার অধ্যাপনার বিষয় ইতিহাস। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, বিশেষ করিয়া স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহে পড়াশোনা লইয়া ব্যস্ত থাকে। ছাত্র মহলে তাহার খুব নাম হইয়াছে।

ব্রজনাথের পরিবারে ধর্মনিষ্ঠা প্রবল। পিতা ছিলেন পরম ভক্ত বৈষ্ণব, শান্ত, সহিষ্ণু, উদার চরিত্রের লোক। খুল্লতাত রঘুনাথ তাহার অপেক্ষা মাত্র কয়েক বৎসরের বড়, কিন্তু ব্রজনাথের চরিত্র গঠনে পিতা অপেক্ষা খুল্লতাতের প্রভাব বেশী কার্য্যকরী হইয়াছিল। বাল্যে দুর্দান্ত ও কৈশরে উৎসাহী স্বদেশী ভলান্টিয়ার খুল্লতাত কি ভাবে পারিবারিক ধর্ম-মানসিকতার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন সে জানে না, কিন্তু তাঁহার ধর্ম যে তাহাদের পরিচিত, পারিবারিক, পুরাতন ধর্ম নয়, তাহা যে একটা রহস্যময়, উত্তেজক, নূতন জিনিস তাহা বুদ্ধি দিয়া না বুঝিলেও হৃদয় দিয়া সে অনুভব করিয়াছিল এবং এই নূতন ধর্মের দ্বারা সে প্রভাবিত হইয়াছিল।

পারিবারিক আবেষ্টনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কলিকাতায় পড়িতে গেল, জ্ঞানের সাধনার মধ্যে নূতন রস পাইল, কিন্তু খুল্লতাতের নূতন ধর্ম, যাহা দেশ মাতাকে জগন্মাতার আসনে স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার প্রভাব ব্রজনাথের অজ্ঞাতসারে তাহার জ্ঞানের সাধনার পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ব্রজনাথ হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিল। আদিনাথ ইতিমধ্যে রাজেন বাবুর বাড়ী গিয়াছিল মানদাকে মাতার আগমন সংবাদ জানাইতে।

ব্রজনাথ ইন্দ্রের বৈঠকখানার বারন্দায় বসিয়া সংবাদপত্র দেখিতেছিল। ইন্দ্র কাছারীর কাজ সারিয়া সেখানে আসিয়া বলিল।

ইন্দ্র বলিল—আপনি খুব পড়াশোনা করেন আদির কাছে শুনেছি, সে বলে দাদার বিলেত যাবার খুব ইচ্ছা, মার জন্য যেতে পারছেন না।

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল—আপনি আদির কাজে সব খবর নিয়েছেন দেখছি। আদির দু'চারটে কথায় বুঝেছি আপনাকে খুব ভক্তি করে। ওকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে নরম করে দিন। মার সঙ্গে না গেলে তিনি আঘাত পাবেন মনে।

ইন্দ্র বলিল—ও নিজেই যাবে, ভাববেন না।

আদিনাথ মানদাকে আনিতে গিয়াছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে ঢুকিল। শরৎসুন্দরী কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর সময়ে মানদা তারাপুরে ছিল না। মৃত্যুর পরেও কর্ত্তৃপক্ষ যাইতে দেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ মানে রাঘব। রাজেনবাবুর অমত ছিল না, কিন্তু রাঘব দৃঢ় আপত্তি করিয়াছিল। রাঘব দারোগা তাহার খুড়শ্বশুরকে ধরাইয়া দিয়াছে গ্রামে এই রকম একটা গুজব প্রচারিত হওয়ায় ক্ষিপ্ত হইয়া সে স্ত্রীর উপর নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল এই গুজব মানদা প্রচার করিয়াছে।

লক্ষ্মী কাছে বসিয়াছিল। কাঁদিয়া মনের ভার একটু হালকা হইলে শরৎসুন্দরী তাহাকে বলিলেন—মা, লোকের মুখে বাপের সুখ্যাত শুনে কর্তা ছেলের স্বভাব চরিত্রের খোঁজ না নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন। তখন কে জানত আমার সোনার প্রতিমার এই অবস্থা হবে?

বিকালের দিকে ত্রিনয়নী কনিষ্ঠা কন্যা সরস্বতী ও পুত্র উমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন শরৎসুন্দরীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য।

ত্রিনয়নী ও সরস্বতী ভিতরে গেল, উমানন্দ আসিয়া ইন্দ্রের পিছনে দাঁড়াইল। ব্রজনাথ ও ইন্দ্র আলাপ করিতেছিল।

ব্রজনাথ বলিল—ভারতবর্ষের বাইরে বিপ্লবীদের কাজের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন? এদেশের কাগজে খুব কম খবরই বেরোয়। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নাম অনেক জানে তাঁর ইণ্ডিয়া হাউজ ও "ইণ্ডিয়ান সোশিয়ালিষ্ট" কাগজের জন্য। কৃষ্ণবর্মার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া হাউস এখন সাভারকর চালাচ্ছেন, কৃষ্ণবর্মা প্যারিসে পালিয়েছেন ও সেখানে মাদাম কামা ও এস. এ. রাণাকে নিয়ে একটা বিপ্লবী কেন্দ্র গড়েছেন। জার্মাণ সোশিয়ালিষ্ট ও রুশিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ আছে শোনা যায়। আইরিশ সীন ফীনদের সঙ্গে সংযোগের কথাও শোনা যায়। সঠিক খবর কে দিচ্ছে বলুন? এঁরা ছাড়া আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ও ভ্যাঙ্কুবার ষ্টেটে একটা দল গড়ে উঠেছে শোনা যায়। সেদিন একখানা কাগজে দেখছিলাম গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়েছে এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের শিকড় তুলতে হলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানে

ছাত্রের ছদ্মবেশ যে সব ভারতীয় বিপ্লবপন্থী যুবকেরা ঘোরা ফেরা করছে তাদের দমন করা।

ইন্দ্র সাভারকরের কথা তুলিয়া বলিল—মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী বলতে আমরা নাটু ভ্রাতাদের, চাপেকর ও তিলককে বুঝি। আজকাল সাভারকরের নাম শোনা যাচ্ছে।

ব্রজনাথ—একজন মারাঠি বিপ্লবী বীরের নাম আমরা ভুলে গেছি।

ইন্দ্র—কার কথা বলছেন?

ব্রজনাথ—এই মারাঠি বীর ছিলেন একজন ডাকাত। আমাদের ভবানী পাঠকের মত ডাকাত আর কি। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে, বিশেষ করে বোম্বাই প্রদেশে, দুর্ভিক্ষের সময়ে একদল মারাঠি ডাকাতের অভ্যুদয় হয়। তাদের নেতা ছিলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। ডাকাতরা ধনীদের অর্থ লুটে অনশনী দরিদ্রদের মধ্যে বিলোত। ফাড়কের নেতৃত্বে ডাকাত দল বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দেশে বিপ্লবের আশঙ্কায় সরকার চঞ্চল হয়ে ওঠেন, বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়। ধরা পড়ে বিচারে ফাড়কের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। সে আমলের একখানা কাগজ রুশিয়ার নিহিলিষ্টদের সঙ্গে বাসুদের বলবন্ত ফাড়কের দলের তুলনা করেছে।

ইন্দ্রের পিছনে দাঁড়াইয়া উমানন্দ উসখুস করিতেছিল। ব্রজনাথ বলিল—এটি কে? আপনার শ্যালক?

ইন্দ্র পিছনে হাত বাড়াইয়া উমানন্দকে ধরিল। বলিল—কি আনন্দ, কিছু খবর আছে?

উমানন্দ সংবাদপত্র হইতে কাটা একখানি ছবি ইন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—এটা কার ছবি বলুন ত?

ইন্দ্র দেখিল ছবিটি কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের। উমানন্দ কি বলে শুনিবার জন্য সে চুপ করিয়া রহিল।

উমানন্দ সগর্বে বলিল—বলতে পারলেন না? এটা কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের ছবি। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিলের সেনাপতি।

কয়েকদিন আগে কাগজে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের মৃত্যু সংবাদ, জীবনী ও

ছবি বাহির হইয়াছিল। অসামরিক জাতি ও ভীতু বলিয়া বাঙ্গালীর তখনও দুর্নাম। অজ্ঞাতনামা একজন বাঙালীর ছেলে সুদূর ব্রেজিলে গিয়া সৈন্য বিভাগে উচ্চপদ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে হঠাৎ এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস বাংলার ছেলেদের "হীরো" হইলেন।

উমানন্দের পিঠে হাত বুলাইয়া ইন্দ্র বলিল—আমাদের কর্ণেল আনন্দ হবে বাংলার সেনাপতি, কি বলো?

অন্দরে শরৎসুন্দরীর সঙ্গে ত্রিনয়নীর আলাপ হইতেছিল।

সরস্বতীর দিকে চাহিয়া শরৎসুন্দরী বলিলেন—লক্ষ্মী মার তুলনা নেই। আপনার ছোট মেয়েটিও সুন্দরী, খুব ভাল করে ঘর বরের খোঁজ দিয়ে এটির বিয়ে দেবেন। বড বোন রাজার ঘরে পড়েছে, একেও রাজার ঘরে ছাড়া দেবেন না।

ত্রিনয়নী বলিলেল—ওর বিয়ের ভাবনা আমরা আর ভাবি না দিদি, ভেবেই বা কি করব? ইন্দ্র যেখানে মত করবে সেখানেই দেব।

শরৎসুন্দরী—ও মেয়েকে দেখে অনেকে বৌ করতে চাইবে। কোথাও দেখিয়েছেন?

ত্রিনয়নী—অবসর পেলাম কই? বড ছেলের জন্য ভাবনায় আমরা সকলেই কাতর।

দেবানন্দের ইতিহাস শরৎসুন্দরীর অজ্ঞাত ছিল না। শরৎসুন্দরী একটু বিমনা হইলেন। পুত্রস্নেহে যে দেবরকে মানুষ করিয়াছিলেন তাহার কথা মনে পড়িল। সে গ্রেপ্তার হইবার পরে উকিল ভরসা দিল কোন প্রমাণ নাই পুলিশের হাতে, নিশ্চয় ছাড়া পাইবে। হইল পাঁচ বছরের জেল। আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন কিনা কে জানে?

ত্রিনয়নী বলিলেন—বাইরে ইন্দ্রের সঙ্গে বসে কথা বলছে ঐটি বুঝি আপনার বড় ছেলে? শুনেছি খুব ভাল করে পাশ ক'রে কলেজে চাকুরি করছে।

শরৎসুন্দরী—চাকুরি পেয়েছে। উন্নতি হবে শুনি। বাসায় বামুন চাকর নিয়ে থাকে, কিছুদিন আগে ছোট ভাইকে নিয়ে গেছে। কাকাকে বড় ভালবাসত, মনে আঘাত পেয়েছে কাকার জেল হওয়াতে। চাকুরি হয়েছে, বাসা হয়েছে, বলি—বাবা, এবার একটা বিয়ে কর, কে দেখাশুনা যত্ন আত্তি

করবে? সহজে কোন জবাব দেয় না। পেড়াপীড়ি করলে বলে—যদি মনে কর আমার কষ্ট হচ্ছে তা'হলে তুমি এসে থাক। আমি বলি—আমাকে যে যেতে বলছিস, গোবিন্দজীকে কার হাতে দিয়ে যাব?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বড় দুঃখের কপাল করে এসেছিলাম বোন। মা মরা দেওরকে ছেলের মত মানুষ করলাম, সে গেল জেলে। বড় ছেলের এই অবস্থা। মধ্যমটি ত শেকল-ছেঁড়া পাগল, মনটা নরম কিন্তু বড় একগুঁয়ে। যে দিন কাল পড়েছে কবে ওকেও ধরে নিয়ে যায় তাই ভেবে কাঁটা হয়ে আছি। বড় ভাইয়ের ইচ্ছে ও পড়াশোনা করুক, তা কি করবে?

ত্রিনয়নী বলিলেন—আদিকে নিয়ে যান সঙ্গে করে। ও বড় ভাল ছেলে দিদি, কিন্তু ভাল ছেলে দেখলেই মনে ভয় হয় এখন।

সন্ধ্যার পরে ব্রজনাথকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র টোলপাড়ায় গেল জীবানন্দের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিবার জন্য।

জীবানন্দের ঘরে ঢুকিয়া তাহারা দেখিল রাজেন বাবু বসিয়া আছেন। জীবানন্দ ও রাজেনবাবুর মুখ একটু গম্ভীর, মনে হইল কোন অপ্রিয় আলোচনা চলিতেছিল।

ইন্দ্রের সঙ্গে ব্রজনাথকে দেখিয়া রাজেনবাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন, আবার কি ভাবিয়া বসিয়া পড়িলেন। জীবানন্দ ইহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন।

ব্রজনাথকে সম্বোধন করিয়া জীবানন্দ বলিলেন—আসুন ব্রজনাথ বাবু, বসুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ভারি উৎসুক হয়েছিলাম। শরীর তেমন ভাল নয়, তাই বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইনে। জানতাম ইন্দ্র আপনাকে নিয়ে আসবে।

উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে তিনি বলিলেন—নূতন শাসন সংস্কার সম্বন্ধে কলকাতায় কি রকম আলোচনা চলছে? আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, খবরবার্তা পেতে দেরি হয়, আবার সব খবর পাইও না।

তখন মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার লইয়া হিন্দু ও মুসলমান, মডারেট ও নেশনালিষ্ট এবং মডারেট দলের নিজেদের মধ্যে বিবাদ জমিয়া উঠিতেছিল।

সমালোচকগণ শাসন সংস্কারকে "দিল্লীকা লাড্ডু", "lollypop", "deformed scheme", "a doll to please children with", "মাকাল ফল" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিলেন। রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আর কয়েকজন সভ্য রিফর্মস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিলেন।

ব্রজনাথ বলিল—রিফর্মস কি হবে সেটা এখন চাপা পড়েছে, পৃথক নির্বাচন নিয়ে আন্দোলন চলছে। আমির আলি সাহেব গভর্ণমেণ্টকে খোলাখুলি বলেছেন রাজনৈতিক ব্যাপারে মুসলমানরা হিন্দুদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। মুসলমানরা শুধু যে পৃথক নির্বাচনের অধিকার চান তা নয়, তাঁদের একদল চাইছেন হিন্দুদের সঙ্গে সমান সংখ্যক আসন।

ইন্দ্র—এটা অন্যায় আবদার। দেশে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে হিন্দুদের সঙ্গে সমান সংখ্যক আসনের দাবিতে রাজি হতেন?

ব্রজনাথ—এই অন্যায় আবদার করবার সাহস হয়েছে গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদের অবিশ্বাস করেন বলে। মুসলমান কাগজ স্পষ্ট ভাষায় বলছে—"রাজদ্রোহী হিন্দুদের সঙ্গে রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নাই, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য পৃথক নির্বাচন চাই।

জীবানন্দ—মডারেটরা কি বলেন? রাজেনবাবু "বেঙ্গলীর" ভক্ত, কিন্তু বেঙ্গলী পৃথক নির্বাচনে আপত্তি করছে।

ব্রজনাথ—শুধু আপত্তি করা নয়, বেঙ্গলী স্পষ্ট বলেছে—"The policy of separate electorates will cause a partition not of one province and one community, but of the whole of India."

রাজেনবাবু—বেঙ্গলী একথা বললেও নেতারা শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের দাবি মেনে নেবেন।

জীবানন্দ—এক দেশের অধিবাসীদের মধ্যে কোন একটা সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দাবির প্রথম কিস্তি এইভাবে মেনে নিলে সে দাবির শেষ কিস্তির বেলায় কি করবেন? আপনি কি বলেন রাজেন বাবু?

রাজেনবাবু—শেষ কিস্তি অর্থে আপনি কি বোঝাতে চান, রায় বাহাদুর? আমার মনে হয় আপনি ব্যাপারটা "রং এঙ্গেল অব ভিশন" থেকে দেখছেন।

হিন্দু মুসলমান দুই ভাই ; হিন্দু জ্যেষ্ঠ, মুসলমান কনিষ্ঠ। ছোট ভাই যদি একটা বায়না করেই বসে বড় ভাইয়ের মনে ভ্রাতৃস্নেহ থাকলে সে কি করবে? মুসলমানরা চাইছে সামান্য কিছু বিশেষ ·সুবিধে। এই বিশেষ সুবিধেটুকু দিলে এত বড় হিন্দুসমাজের কি ক্ষতি হবে?

ব্রজনাথ—শেষ কিস্তির কথা থাক্, প্রথম কিস্তিতেই দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের দেখাদেখি এংলো-ইণ্ডিয়ানরা, মাদ্রাজের দেশী খৃষ্টানরা, বেলারীর অল-ইণ্ডিয়া বীরশৈবদল পৃথক নির্বাচনের অধিকার দাবি করেছেন। আবার উৎকল বার্তা নামে একখানা কাগজ লিখেছে—"ওড়িয়ারা অনগ্রসর হইলেও রাজভক্ত। মুসলমানদের মত তাহারাও বিশেষ সুবিধা পাইবার অধিকারী। তাহারা বরাবর সরকারের প্রত্যেকটি কাজ সমর্থন করিয়াছে।"

ইন্দ্র—আমি দেখছি ইংরাজ ভারতবর্ষকে এক করতে চায় কিন্তু ভারতবাসীদের এক হতে দিতে চায় না। তাদের পক্ষ থেকে বিভেদ ঘটাবার সকল চেষ্টা সত্বেও ভারতবাসীরা শেষে এক হয়ে যায় এই ভয়ে তারা সেই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করছে।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া জীবানন্দ ও ব্রজনাথ তাহার দিকে চাহিল।

ব্রজনাথ বলিল—আপনি খাঁটি সত্যকথা বলেছেন ইন্দ্রবাবু।

তাঁহার কাজ আছে বলিয়া রাজেনবাবু উঠিলেন। তিনি চলিয়া গেলে জীবানন্দ ব্রজনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনি মাকে নিয়ে ইন্দ্রের ওখানে উঠেছেন এতে রাজেনবাবু খুব চটে গেছেন। কাজটা ভাল হয়নি। আমি অবশ্য বুঝিয়ে বলেছি যে আপনার পৌত্র-পৌত্রী হয়নি, ব্রজনাথবাবুর মা আপনার গৃহে অন্নগ্রহণ করবেন কি করে? আপনি কাল সকালে একবার দেখা করে বুঝিয়ে বলবেন।

ব্রজনাথ সংক্ষেপে বলিল—আচ্ছা।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর ত্রিনয়নীর আহ্বানে তাহারা ভিতরে গিয়া জলযোগ করিতে বসিল। মাতার আদেশে সরস্বতী খাবার পরিবেশন করিল। তাহার জড়সড় ভাব দেখিয়া ইন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

তাহারা বিদায় লইবার সময়ে জীবানন্দ বলিলেন—শুনলাম আপনি

আদিনাথকে নিয়ে যেতে এসেছেন। ইন্দ্রের সেবকাশ্রম দু'বার তল্লাস হয়েছে, আদিনাথকে কিছুদিন অন্যত্র সরিয়ে নেয়া ভাল।

ব্রজনাথ—মার কথা আদি ফেলতে পারবে না। অনিচ্ছা থাকলেও যাবে বোধ হয়।

আদিনাথকে গৃহে ফিরিবার মত করাইবার জন্য শরৎসুন্দরী ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা ভাল মনে করিলেন। ভাবিলেন, কি জানি ছেলে যা এঁকগুয়ে, যদি যাইতে রাজি না হয়।

ইন্দ্রকে তিনি বলিলেন—বাবা, তুমি ও পাগলটাকে বুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা না করলে ত হয় না। ব্রজকে ও জব দিয়েছে—আমি পড়ব না। না পড়ে না পড়ল, বাড়ীতে চলুক না কেন? ক্ষেতখামার, বিষয় সম্পত্তি দেখার লোক নেই। বিধবা মানুষ, আমি আর কতদিক আগলাব?

ইন্দ্র তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—আদি ঠিক যাবে, আপনি ভাববেন না।

পরদিন বৈঠকখানা দালানে ইন্দ্র ও ব্রজনাথ বসিয়া আলাপ করিতেছিল একখানা খবরের কাগজ হাতে আদিনাথ আসিল। প্রথমপাতায় একটি খবর নির্দেশ করিয়া সে বলিল—বিলাতের খবর পড়ুন।

ইন্দ্র খবরটি পড়িয়া কাগজখানা ব্রজনাথের হাতে দিল। মদনলাল ধিংড়া নামে একটি ছেলে লণ্ডনের ইম্পিরীয়াল ইনষ্টিটিউটের সভায় স্যর কুর্জন-ওয়াইলীকে গুলি করিয়াছে হত্যা করিয়াছে। স্যর কুর্জন-ওয়াইলীকে বাঁচাইতে গিয়া ডাঃ লালকাকা নামে একজন ভারতীয়ও নিহত হইয়াছে।

খবরটি পড়িয়া ব্রজনাথ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একবার চোখ বুলাইয়া হাসিয়া বলিল—ধিংড়ার কাজের প্রতিবাদ করে সম্পাদক কি লিখেছেন পড়ে দেখুন।

ইন্দ্র পড়িল—"ইংরাজি শিক্ষার ফলে কতকগুলি ভারতীয় যুবকের মাথা খারাপ হইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষা গুপ্তহত্যা জিনিষটি বিদেশ হইতে এদেশে আনিয়াছে। দেশের জন্য মরিতে মদনলালের মত যুবকরা এত ব্যগ্র কেন? ম্লেচ্ছভাবে পূর্ণ বালক আসিয়াছে হিন্দুকে মরিতে শিখাইতে?"

ইন্দ্রের পড়া শেষ হইলে ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল—এই মত শিক্ষিত সমাজের শতকরা নব্বই জনের। দেশের নেতারা সরকারের মুখ চেয়ে উচ্চকণ্ঠে

বিপ্লববাদের নিন্দা করছেন। আর কাগজওয়ালারা? কেউ বলছেন ধর্মবর্জিত ইংরাজি শিক্ষা দেশে বিপ্লববাদ এনেছে। কেউ বলছেন হিন্দুদের অদৃষ্ট-বাদে, কর্মফলবাদে বিশ্বাস হারিয়ে বাঙালীর ছেলেরা দানবীয় সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী হয়েছে। কেউ বলছেন সন্ত্রাসবাদ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। আবার কেউ বলছেন, পাপ কর্মের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না; করা গেলেও সে স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় নয়।

ব্রজনাথের কথা শুনিয়া ইন্দ্র হাসিল। তাহার হাসি দেখিয়া ব্রজনাথ বলিল—আপনি হাসছেন। জানিনে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না বিপ্লবী আন্দোলনের সুরু থেকে এদেশের চিন্তা নায়করা তার নিন্দা করবার জন্য কি ধরণের যুক্তির প্রয়োগ করেছেন। এঁদের সর্ববাদীসম্মত মত এই যে—এনার্কিজম বিদেশী আমদানী। এদেশের মাটির, এদেশের মানুষের রক্তের, এদেশের কালচর ও ট্রাডিশনের সঙ্গে এব যোগ নাই, এটা নিছক অনুকরণ প্রবৃত্তি হতে অথবা বিকৃত বুদ্ধি হতে উদ্ভূত। কেউ আবার বলছেন স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খাটাই শাস্ত্র বিগর্হিত পাপ প্রবৃত্তি। বোমা, রিভলবার নিয়ে ইংরাজেব কামান বন্দুকের সঙ্গে পারবে না, অন্যপথ দেখ—এই সোজা কথাটা বলবার সাহস কারো নেই, দেশের রামা শ্যামা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ সেজে পাঁতি দিচ্ছেন। তাঁদের মতে এদেশে ইংরাজ-শাসন অক্ষয়, অব্যয়, ভগবানের বিধান।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল—এঁরা ইংরাজের কাছে এই যুক্তি ধার করেছেন না ইংরাজ তাঁদের মুখের কথা লুফে নিয়েছে বোঝা যায় না। লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা পড়েছেন? তিনি সম্প্রতিকার এক বক্তৃতায় বলেছেন—"A spirit hitherto unknown to India has come into existence, a spirit opposed to all the teachings of Indian religion and tradition, a spiɹit of lawlessness and anarchy." জবরদস্ত, বিদেশী ও বিধর্মী শাসনকর্তার মুখে ইণ্ডিয়ন রিলিজিয়ন ও ট্র্যাডিশনের দোহাই-টুকু লক্ষ্য করেছেন? তারপর দেখি বিলাতের টাইমস পত্রিকা পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছে ভারতবাসীরা তাদের প্রাচীন philosophy of renunciation and asceticism, religion of self-abnegation and

innate indifference to worldly matters ত্যাগ করে য়ুরোপের মেটিরিয়ালিজমের দিকে ঝুঁকেছে দেখে। টাইমসের মুখে পরাধীন ভারতবাসীর বৈরাগ্য ও ত্যাগের প্রশংসার অর্থ কি অনুমান করতে পারব না আমাদের এতই বোকা মনে করে ওরা? আমাদের একজন পণ্ডিত লোকের কথা মনে পড়ল। বিপ্লব বাদের নিন্দা করে তিনি বলেছেন, শাস্ত্রে বিশ্বাস কর; হিন্দুর ছেলে অদৃষ্টবাদ ছেড়ো না। যখন সময় হবে আপনা থেকে সব হয়ে যাবে। বলেছেন—Heaven helps those that help themselves—এটা বিধর্মী ইংরাজদের কথা। একথা সত্য নয়। আমাদের কথা হচ্ছে Heaven helps those that cannot help themselves. ব্রজনাথ হাসিতে লাগিল।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—যুক্তির কত রকম মারপ্যাঁচ আমাদের জানা আছে দেখছেন?

আদিনাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া আলোচনা শুনিতেছিল। সে বলিল—যুক্তির মারপ্যাঁচে কেউ কম যায় না। মাদ্রাজের জজ পিংলে সাহেব সিডিশন আইনের এক নূতন ব্যাখ্যা করেছেন—"to speak disrespectfully of non-official Europeans, who belong to the ruling race, is to bring the Government into contempt and hatred and punishable under section 124 A"

আরও দুই চারিটা কথার পর ইন্দ্র উঠিল। বলিল—আদি, আমার সঙ্গে এসো। ব্রজনাথ বাবু, একটু বসুন, আমি আসছি।

উভয়ে অন্দরে গেল।

শরৎসুন্দরী লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা মানদাও আসিয়াছিল। ইন্দ্রকে দেখিয়া লক্ষ্মী ও মানদা মাথায় কাপড় দিল।

আদিনাথকে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখিয়া শরৎসুন্দরী বলিলেন—হ্যাঁ রে আদি, মা পড়তে মরতে এখানে এল আর তুই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস।

আদিনাথ কোন উত্তর দিল না।

শরৎসুন্দরী আবার বলিলেন—ইন্দ্রের মত হয়েছে, কাল তোকে নিয়ে তারাপুর রওনা হব। যাবার সময় আবার পালিয়ে যাসনে বাবা। মানদাও

যাবে। অনেক কেঁদে কেটে ওর শ্বশুরের মত করিয়েছি। পনের দিনের কড়ারে নিয়ে যাচ্ছি।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—সকাল ন'টার সময়ে ওঁরা বেরোবেন। তার আগে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আদিনাথকে বলিল—আদি, তুমি এখানে বসো, আমি বাইরে যাচ্ছি।

ইন্দ্র চলিয়া গেল লক্ষ্মী মাথার কাপড় সরাইয়া বলিল—আদি ঠাকুরপো, মায়ের সঙ্গে বাড়ী যাবেন, মুখ অত ভার ভার কেন ? মানদা দিদির দিকে চেয়ে দেখুন, মুখে হাসি ধরছে না।

মানদা বলিল—এখনও ভয়ে ভয়ে হাসছি ভাই। পতিসরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে মোষের গাড়ী যখন ভাদুই নদী নৌকোয় পার হয়ে তারাপুরের রাস্তায় পড়বে তখন প্রাণখুলে হাসব।

ত্রিনয়নী ব্রজনাথ, ইন্দ্র ও আদিনাথকে রাত্রে খাইতে বলিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে ইন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়িল তাহার সতীন দার কথা। ব্রজনাথের কাছে সে সতীন ও দেবানন্দের গল্প করিল। বাড়ীতে ফিরিয়াও কিছুক্ষণ সেই গল্প চলিল।

ব্রজনাথ নিজের কথা বলিল। বলিল, লোকে জানে সে ইতিহাসের অধ্যাপক কিন্তু বাস্তবিক সে ইতিহাসের ছাত্র মাত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইসলাম-অবলম্বী আফগান ও তুর্কীদের এবং ইংরাজদের এদেশে আসিবার আগে যে সকল জাতি ও দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক ও সংযোগ ছিল তাহাদের ইতিহাস সে পড়িতেছে। সে উদ্ধার করিবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই গুপ্ত তথ্য—কোন মারাত্মক ত্রুটির জন্য সংখ্যায় বিপুল, বুদ্ধি ও জ্ঞানে মহান এত বড় একটা জাতি বার বার মার খাইয়াছে বিদেশীর হাতে। আবার সাংঘাতিক মার খাইয়াও বাঁচিয়া আছে। এই রহস্যের অনেক রকম ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরা দিয়াছেন, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই তাহার কাছে সন্তোষজনক মনে হয় নাই। তাই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে নিজে অনুসন্ধান করিয়া এই তথ্য সে উদ্ধার করিবে, যত পরিশ্রম হউক, আর যত দিন লাগুক।

ইন্দ্র গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাহার কথা শুনিল। ভাবিল, তাহার সৌভাগ্য নূতন রকমের একজন দেশকর্মীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল। সন্দেহে, দ্বিধায়,

পরামর্শের প্রয়োজনে ইঁহার সাহায্য পাওয়া যাইবে, মনের·ভার লাঘব করিবার জন্য ইঁহার কাছে যাওয়া চলিবে।

পরদিন বিদায় দিবার সময়ে ব্রজনাথের কাঁধে হাত রাখিয়া ইন্দ্র মনের এই ভাব ব্রজনাথকে মৃদুকণ্ঠে জানাইল। ব্রজনাথ তাহাকে পরম আত্মীয়ের মত আলিঙ্গন করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

আদিনাথ পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল —দাদা, আসি।

ইন্দ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—এস ভাই।

পুত্র আদিনাথকে সৎপথে আনিবার জন্য শরৎসুন্দরীর চেষ্টা সফল হইল না। ছুটি শেষ হইতে ব্রজনাথ কলিকাতা চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে কোন খবর না দিয়া আদিনাথ হঠাৎ রাজনগরে ফিরিয়া আসিল।

ইন্দ্র তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া আহ্লাদিত হইল।

৫

আদিনাথ ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরে সেবকাশ্রমের বাড়ীতে শরৎ পণ্ডিতের কথকতা হইতেছিল।

শরৎপণ্ডিতের কথকতার খবর পাইলে পুলিশের ভয় ভুলিয়া ইতরভদ্র কিছুপরিমাণ লোক এখনও সেবকাশ্রমে আসে। আজও আসিয়াছিল। মেয়েরাও দশ-বিশজন আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট চিক দেওয়া বসিবার জায়গায় বসিয়াছিলেন। কথকতার মাঝে মাঝে পণ্ডিত মুকুন্দ-দাসের অনুকরণে রচিত দুই চার খানা গান করিলেন। পণ্ডিতের মুখে এই গান শ্রোতাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

কথকতা শেষ হইতে শ্রোতাগণ চলিয়া গেলেন, ইন্দ্র, রজনী ডাক্তার, শরৎ-পণ্ডিত ও রাজেনবাবু সেবকাশ্রমের একটি কক্ষে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজেনবাবু বলিলেন—পণ্ডিত, রাম রাবণের যুদ্ধের যে রকম সিডিশাস ব্যাখ্যা আজ করলে আর ও রকম ব্যাখ্যা ক'রোনা। তারপর ও গানটা কেন করলে—"এবার আমায় বিদায় দে মা"? সিডিশাস ধুতির কথা তুমি বুঝি এখনও শোন নি?

রজনীডাক্তার উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—মাষ্টার মশায়ের সিডিশান ফোবিয়ার চিকিৎসা করা আবশ্যক হয়েছে।

রাজেনবাবু বলিলেন—ডাক্তারের সব কথায় ইয়ার্কি। আগে ব্যাপার শোন, তারপর ইয়ার্কি ক'রো। হাওড়া হাটে একজন খদ্দের একজোড়া শাড়ি কিনলেন। শাড়ির পাড়ে ক্ষুদিরামের নামে প্রচলিত ঐ গান "এবার আমায় বিদায় দে মা"। পুলিশ কার কাছে খবর পেয়ে খদ্দেরকে ধরল। তারপর ধরল যে দোকানী কাপড় বেচেছিল তাকে, যে তাঁতী কাপড় বুনেছিল সেও ধরা পড়ল। একে একে একশটি লোক ধরা পড়ল এই সিডিশাস শাড়ির দরুণ। তাঁতী ও যে ব্যক্তি এই রকম পাড়ের ফরমায়েস দিয়েছিল তাদের জেলে ঠেলল।

রজনীডাক্তার হাসি বন্ধ করিয়া বলিলেন—এ যে ভয়ানক সিরীয়াস ব্যাপার মশাই। আমি ভেবেছিলাম আপনি ঠাট্টা করছিলেন। ওহে পণ্ডিত, ঐসব বিদায় টিদায়ের গান আর গেও না। ফ্যাসাদে পড়ে যাবে নির্ঘাৎ।

শরৎপণ্ডিত গম্ভীরভাবে বলিলেন—ফ্যাসাদং সর্বভূতেষু খলু নরজন্মনি। ইন্দ্র পণ্ডিতের সংস্কৃত বচন শুনিয়া হাসিল।

রাজেনবাবু বলিলেন—ইন্দ্র, তোমাদের তেহাটা মহালের রাজাউল্যা ফরাজী নাকি আবার গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করছে। জুম্মাঘরে ঘন ঘন মিটিং করছে। হিন্দুদের বাড়ীতে চাকুরি ক'রোনা, তাদের জমি বর্গা চাষ ক'রোনা—এইসব প্রচার করছে।

ইন্দ্র ইহা জানিত। ১৯০৬ ও ৭এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পরে দেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কতকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল। আলিগড় দলের নেতারা কেহ কেহ কংগ্রেসে যোগ দিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কারে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার ঘোষিত হইলে তাঁহারা সরিয়া গেলেন। দেশে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্বন্ধ

আবার তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। নানা স্থানে গোলমাল দেখা দিল। পেশোয়ারে হিন্দুদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল; উপদ্রুত অঞ্চলের হিন্দুরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার পাইলেন না। বোম্বাইতে দাঙ্গা হইল। বকর-ইদের সময়ে কলিকাতায় গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। দ্বারবঙ্গে দাঙ্গা হইল, খুলনা ও যশোহরে ব্যাপক ও ভয়ানক দাঙ্গা হইল। এই দাঙ্গার ব্যাপারে সাতাইশ খানা গ্রামে পিটুনী পুলিশ বসিল। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগকে "কাফের, গোলাম ও বুদপরস্ত" বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুস্তিকা বিলি হইতে লাগিল। একখানি মুসলমান কাগজ বলিল—"হিন্দুরা মুসলমানের চিরশত্রু। তাহারা স্বরাজ পাইবার জন্য কংগ্রেস চালাইতেছে। স্বরাজ পাইলে তাহারা মুসলমান-দিগকে পায়ের নীচে পিষিবে, গরু কোরবানী ও মসজিদে নমাজ আদায় বন্ধ করিয়া দিবে।"

পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে মুসলমান রাজপুতদিগকে শুদ্ধি করা লইয়া উত্তর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী আন্দোলন আরম্ভ হইল।

মুসলমানদের মধ্যে এই আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া পাঞ্জাব হিন্দুসভা অধি-বেশনের সভাপতি স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "হিন্দু নেশনালিটির" কথা তুলিলেন। মহারাষ্ট্রে "মারাঠা লীগ" নামে নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। মুস্লিম লীগের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ নবীউল্লা খোলাখুলি বলিলেন:

—"There must be complete separation between Hindus and Mussalmans in every matter and every where, whether in public office or District or Local Board; even in a school Hindus and Mussalmans must enter by separate doors."

জাতির দেহে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ক্ষত ছাড়াও অন্য ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল। একখানি নূতন ক্ষত ক্রমে বড় হইতে লাগিল।

এই নূতন ক্ষত আন্দামান।

নূতন ব্যবস্থা অনুসারে আদিনাথ এখন রাত্রে তাহার দিদি মানদার বাড়ীতে খায় ও সেখানে থাকে। আগে সেবকাশ্রমের বাড়ীতে থাকিত ও অন্য ছেলেদের সঙ্গে সেখানে খাইত। রাঘবকে তুষ্ট রাখিবার জন্য ও সেবকাশ্রমের

নিরাপত্তার জন্য রজনী ডাক্তারের পরামর্শে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছিলেন—তুমি রাত্রে তার বাড়ীতে থাকলে কোন ছলছুতায় তোমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না, সেবকাশ্রমের গায়ে আমাদের অজান্তে হাত দিতে পারবে না।

আলোচনার শেষে সকলে চলিয়া গেলে আদিনাথ লাইব্রেরী ঘর ও আরও দুইটি ঘরে তালা দিয়া চাবি নিমাইয়ের হাতে দিল ও লণ্ঠন হাতে রাস্তায় বাহির হইল। নিমাই মণ্ডল সেবকাশ্রমের ভৃত্য ও রাতের প্রহরী।

রাস্তায় চলিতে চলিতে শরৎ পণ্ডিতের কথকতার কথা আদিনাথের মনে হইল। পণ্ডিত বলিলেন—প্রতি কল্পে রাম ও রাবণ রাক্ষসের জন্ম হইবে। যজ্ঞভূমিজাতা সীতাকে লইয়া প্রতিকল্পে উভয়ের যুদ্ধ হইবে—

এবং রাম সহস্রানি, রাবণং সহস্রশঃ ভূতানি, ভবিত্যব্যানি।

রাবণের মত কূটনীতিজ্ঞ সেনাপতি পরিচালিত পরাক্রান্ত বিজাতীয় অর্থাৎ বিদেশী, রাক্ষস সদৃশ হিংস্র জাতি পুনঃপুনঃ যজ্ঞভূমিজাতা অর্থাৎ যজ্ঞ ভূমির মত পবিত্র—যে ভূমিতে অদ্যাপি দেবাঃ ইচ্ছন্তি জন্ম—সেই পবিত্র ভারতভূমি আক্রমণ করিতে—

রাত্রে গ্রাম্যপথ একেবারে নির্জন হইয়া গিয়াছে। পথের দুই পাশে নীচু ঝোপঝাড় নিস্তব্ধ, বাঁশের ঝাড়গুলির মধ্যে বহু বাদুড় নিঃশব্দে ঝুলিতেছে। নিজের মনে চিন্তা করিতে করিতে আদিনাথ করণ পুকুর পাশে রাখিয়া রাজেন বাবুর বাড়ীর পথ ধরিতে পিছন হইতে কে ডাকিল—

—কে যায় লণ্ঠন হাতে? একটু দাঁড়াও না বাপু।

হঠাৎ ডাক শুনিয়া আদিনাথ চমকিয়া উঠিল। যে ডাকিয়াছিল সে দ্রুতপদে আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইতে আদিনাথ দেখিল তাহার দিদির খুড়তুত ননদ জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা নূতন রাজনগরে আসিয়াছে। আদিনাথ শুনিয়াছে বিবাহের বছর তিনেক পরে বিধবা হইয়া জ্ঞানদা শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু বছর না ঘুরিতে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাহাকে অপবাদ দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার পিতা ইতিমধ্যে মারা গিয়াছিলেন। অন্য আশ্রয় না থাকায় সে জ্যেঠা

রাজেন বাবুর কাছে আসিয়াছে। এখানে আসিবার কিছু দিনের মধ্যে সে নানা কৌশলে রাজেন বাবু ও রাঘবকে হাত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে তাহার দিদির কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন, তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়। আদিনাথ লক্ষ্য করিয়াছে তাহার উপর জ্ঞানদা একটু বেশী সদয়।

তাহাকে দেখিয়া আদিনাথ বলিল—এই আঁধার রাতে বিনা আলোতে কোথায় গিয়েছিলেন ?

জ্ঞানদা—গিয়েছিলাম কথকতা শুনতে। রামোঃ! এই কথকতা শুনতে নাকি মানুষ যায়। রাধাকৃষ্ণের কথা নয়, প্রহ্লাদের চরিত্র নয়, রাম রাবণের যুদ্ধ! আর কথকঠাকুরের গানেরই বা কি ছিরি! কেন বাপু, আমাদের পুরনো গানে কি দোষ হয়েছে ?

কদম তলায় বাজে বাঁশী
শুনে আমার প্রাণ উদাসী

গান শুনে চোখে জল আসবে তবে না বলি কথকতা।

আদিনাথ কোন কথা না বলিয়া লণ্ঠন হাতে চলিতে আরম্ভ করিল।

জ্ঞানদা বলিল—বড় যে হন হন করে চললে ? একটু আস্তে চলো না বাপু। ভয় নেই, ঘাড় মটকাবো না।

আদিনাথ বলিল—বড় ঘুম পেয়েছে। আপনি পা চালিয়ে আসুন।

আদিনাথ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। জ্ঞানদা আর কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু মনে মনে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল আদিনাথের এই ঔদাসীন্যে। মতলব আঁটিয়া সে করণ পুকুরের ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল আদিনাথের জন্য। ক্রুদ্ধ হইয়া সে মনে মনে বলিল—তোমার এই অচ্ছেদ্দার শোধ তুলব তোমার বোনের ওপর, তখন দেখো।

পরদিন আদিনাথ ইন্দ্রকে বলিল—দাদা, মাষ্টার মশায়ের বাড়ী আর থাকা চলবে না আমার।

ইন্দ্র বলিল—কি ব্যাপার আদি ?

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া লইয়া নিম্নস্বরে সে জানাইল যে রাজেনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী জ্ঞানদা তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়

সে শুনিয়াছিল, বিশ্বাস করে নাই। এখন দেখিতেছে যাহা সে শুনিয়াছে মিথ্যা নহে।

ইন্দ্র জ্ঞানদার সম্বন্ধে কোন খবর রাখিত না। সে শুধু জানিত যে আদিনাথের সেবকাশ্রমে থাকা লইয়া তাহার ভগ্নীপতি রাঘব দারোগা অসন্তুষ্ট। এই অসন্তোষের ফলে আদিনাথের ভগ্নীর উপর মাঝে মাঝে অত্যাচার চলিত। এই সব কারণে রজনী ডাক্তার রাজেনবাবুর সঙ্গে কথা বলিয়া তাঁহার বাড়ীতে আদিনাথের রাত্রে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বলিল—তোমার হঠাৎ ও বাড়ী ছেড়ে আসা ঠিক হবে না, আদি। আর কিছু দিন দেখ।

এ সম্বন্ধে আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পরে নানাদিক ভাবিয়া আদিনাথ ইন্দ্রের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল।

ইহার কিছুদিন পরে জমিজমা সংক্রান্ত জরুরী কাজের জন্য মাতার পুনঃপুনঃ তাগিদে আদিনাথকে একবার তারাপুরে যাইতে হইল।

তাহার যাইবার সময় ইন্দ্রের মনে পড়িল রাজেন বাবুর ভাইঝির উৎপাতে আদি রাজনগর ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছিল।

সে বলিল—আদি, তুমি তো পালাচ্ছ না ভাই? তুমি না থাকলে এখানে কাজ চলবে কেমন করে?

আদিনাথ ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল—না দাদা, এখন পালাচ্ছি না। কাজ মিটে গেলেই ফিরব। বোধহয় চার পাঁচ দিনের বেশী দেরি হবে না।

আদিনাথ তারাপুরে চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে ইন্দ্র কলিকাতা হইতে ব্রজনাথের একখানি চিঠি পাইল। ইন্দ্র চিঠিখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়াছিল, সান্ধ্য বৈঠক শেষ হইলে চিঠিখানি আবার ভাল করিয়া পড়িতে বসিল।

ব্রজনাথ লিখিয়াছে—আমি রাজনগরে থাকিবার সময়ে এদেশীয় বিপ্লবী আন্দোলনের দেশীয় সমালোচনা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একদিন আলোচনা হইয়াছিল। বোধহয় আপনার সে আলোচনার কথা মনে আছে। এবার বৈদেশিক সমালোচনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—কাগজে পড়িয়াছেন অনন্তলক্ষ্মণ কানহেরিয়া নামে একজন মারাঠি চিৎপাবন ব্রাহ্মণ যুবক নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে হত্যা করিবার অভিযোগে ধরা পড়িয়াছে। এই হত্যা উপলক্ষ্যে এডভোকেট অব ইণ্ডিয়া নামে ইংরাজদের একখানা কাগজ এদেশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছে : "হত্যা ও সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ আপনার প্রভাব বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ এদেশের পক্ষে চরম অভিশাপ। ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার সময় আসিয়াছে। ইহা না করা পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরাজের মিশন সম্পূর্ণ হইবে না।"

—ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এই বিষ উদগিরণ করা দেখিয়া আমার একটা কথা মনে পড়িল। পাঠ্যাবস্থায় একজন বিদেশী লেখকের লেখা বইতে পড়িয়াছিলাম—একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতবর্ষে যত বিদেশী আক্রমণকারী আসিয়াছে তাহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধের পাত্র হইয়াছেন ভারতবর্ষের চালকলা-খেকো ব্রাহ্মণরা। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। মিডিয়া ও পারশ্য গ্রীক বিজেতার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিল কিন্তু ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হইলেন। এই তীব্র প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন ব্রাহ্মণগণ। তাঁহারা সিন্ধু উপত্যকার পূর্ব অঞ্চলের রাজাদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহারা হইলেন আলেকজাণ্ডারের কঠোর উৎপীড়নের লক্ষ্য।

—একজন ইংরাজ মিশনারী লিখিয়াছেন (Nineteenth Century) ব্রাহ্মণরা বর্তমান অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা পুষ্ট করিতেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের এই ষড়যন্ত্র ধ্বংস করিতে হইবে।

* * * *

পত্রের শেষে ব্রজনাথ লিখিয়াছে মাতার পত্রে সে খবর পাইল আদি আবার রাজনগরে গিয়াছে। মাতা তাহাকে বৃথা আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। তারপর ইন্দ্রকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ জানাইয়াছে তাহার কলিকাতার বাড়ীতে।

পত্র পড়া শেষ করিয়া ইন্দ্র ভাবিল এখন ত ব্রাহ্মণরা সমাজের নেতা নন তবু ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এংলো-ইণ্ডিয়ান দলের এত আক্রোশ কেন ?

ব্রজনাথের পত্রে লিখিত বিষয় তখনও তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল লক্ষ্মীর প্রেরিত ঝি আসিয়া জানাইল তাহার আহারের সময় হইয়াছে, মা ডাকিতেছেন।

ইন্দ্র খাইয়া উঠিয়াছে, লক্ষ্মী খাইতে বসিবে এমন সময় মুকীর মা ঝি আসিয়া বলিল—মা, মাষ্টারের ব্যাটার বৌ ছুটে আইস্যা আমাগো উঠানে ভিরমি নেগে পইড়্যা রইছে আর মাষ্টারের ব্যাটা ব্যাত হাতে খিড়কীতে দাঁড়ায়্যা চেলাচ্ছে। সাথ সাথ মাষ্টারের বাড়ী যে ছুঁড়িডা আইছে সেডাও চেলাচ্ছে।

ইন্দ্র মুকীর মার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। সে বুঝিল রাঘব দারোগা ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে এবং আদিনাথের ভগ্নীর উপর নূতন নির্যাতন সুরু হইয়াছে। নির্যাতনের মাত্রা বেশী হওয়ায় আর সহ্য করিতে না পারিয়া মানদা শ্বশুরের গৃহ হইতে পলাইয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছে।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে বলিল—তুমি বেরিও না, আমি দেখছি।

উঠানে নামিয়া সে দেখিল বাস্তবিক মানদা অজ্ঞানের মত মাটিতে পড়িয়া আছে। ঝি চাকর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া। সে আরও দেখিল পাঁচু ঠাকুর খিড়কীর দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

ঝি চাকরদের সরিয়া যাইতে আদেশ দিয়া ইন্দ্র মুকীর মাকে বলিল—এঁকে ধরে তুলে মার ঘরে নিয়ে যাও।

ইন্দ্রের গলা শুনিয়া মানদা উঠিয়া বসিয়া মাথায় কাপড় দিল। মুকীর মা তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া যে ঘরে লক্ষ্মী ছিল সেখানে লইয়া গেল।

ইন্দ্র পাঁচু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল খিড়কীর দরজায় কয়েকবার জোরে আঘাত পড়িলে মুকীর মা গিয়া দরজা খুলিয়া দিতে মাষ্টার বাবুর ছেলের বৌ দৌড়াইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন ও কয়েক পা গিয়া উঠানে পড়িয়া গেলেন। খিড়কীর বাহিরে গলার আওয়াজ পাইয়া সে নিজে গিয়া দেখিল দারোগাবাবু একগাছা বেত হাতে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া মাষ্টারবাবুর ভাইঝি দারোগাবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে গালাগালি করিতেছেন।

তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—ওটাকে এখনই বের করে দাও, নইলে আমরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসব।

পাঁচু ঠাকুর দারোগাবাবুকে বলিল—আপনি বাড়ী যান। উনি যখন এ বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, বাবু সব ব্যাপার না জেনে কখনই ওঁকে ছেড়ে দেবেন না। গোলমাল শুনে সর্দার, চৌবেজী এসে পড়লে আরও কেলেঙ্কারী হবে। আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া দারোগাবাবু চলিয়া গেলেন, কিন্তু শাসাইয়া গেলেন।

মানদাকে সান্ত্বনা দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া, খাওয়াইয়া, লক্ষ্মী তাহার শুইবার ব্যবস্থা করিল। একা মানদার ভয় করিতে পারে বলিয়া মুকীর মাকে মেঝেতে বিছানা করিয়া শুইতে বলিল।

মানদা কি বলিবার চেষ্টা করিতে বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল—দিদি, আজ কোন কথা শুনব না। আর চোখের জল ফেলবেন না, মন শান্ত করে ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

নিজের আঁচলে তাহার চোখের জল মুছাইয়া জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিল। মুকীর মাকে বলিল,—দোর বন্ধ করে দে।

লক্ষ্মী নিজে খাইয়া যখন শুইতে আসিল তখন অনেক রাত হইয়াছে।

ইন্দ্র তাহার অপেক্ষায় বসিয়া বই পড়িতেছিল। ঘরে ঢুকিয়া ইন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া লক্ষ্মী বলিল—কি মার মেরেছে মানদা দিদিকে, পিঠে, হাতে চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠেছে।

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ইন্দ্র কোন কথা বলিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

৬

মানদা ইন্দ্রের গৃহে আশ্রয় লইবার পরদিন বিকালে আদিনাথ তারাপুর হইতে ফিরিল। তাহার দিদির নির্যাতনের ও লাঞ্ছনার কাহিনী শুনিয়া সে কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইন্দ্রকে বলিল—আমি একবার দারোগার বাড়ীতে যাচ্ছি দাদা। ঐ পিশাচটাকে খুন করে

ফাঁসী যাব। নির্যাতিত নারীর উদ্ধার দেশোদ্ধারের চাইতে কম বড় কাজ নয়।

তাহার চোখ মুখের চেহারা দেখিয়া ইন্দ্র হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইল। বলিল—আদি, মাথা ঠাণ্ডা করে আমার কথা শোন। তুমি কি ভেবেছ রাঘববাবুকে খুন করলে তোমার ভগ্নী সুখী হবেন, না তুমি ফাঁসী গেলে তিনি সুখী হবেন? আমার এক ছোট বোন আছে, তাকে তুমি দেখ নাই। সে আজ সকালে এখানে এসেছে। তোমার ভগ্নী মানদার মত আমার বোন চিন্ময়ীও দুঃখের কপাল করে এসেছে পৃথিবীতে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া ইন্দ্র আবার বলিল—সকালে চিনি যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল তার চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। সে ছিল পটে আঁকা দেবী প্রতিমার মত সুন্দরী, ফুলের মত কোমল, দেহে ও মনে। কোনদিন তাকে জোরে কথা বলতে শুনিনি, কোনদিন কোন অভিযোগ করতে শুনিনি; নীরবে, নতমুখে সব সয়ে যাওয়া তার অভ্যাস। এইত সেদিন, বছর পাঁচ ছয় হল, তার বিয়ে হয়েছে। বাইরের জলুস দেখে বনেদী ঘরে ওর বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। বাড়ীর লোকজনের চরিত্রের কথা আগে কিছু জানতে পারা যায়নি, জানা গেল বিয়ের পরে। মাঝে মাঝে ভাবি ওর মত নরম, শিশুর মত নির্মল স্বভাবের মেয়েকে যারা নির্যাতন করতে পারে তারা কি রকম মানুষ! নিত্য লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ত আছেই, পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেয় না। যত দামী গয়না, শাড়ি আমারা দিয়েছি সব কেড়ে নিয়েছে। বাড়ীর ঝির উপযুক্ত কাপড় ওকে পরতে হয়, হাতে শুধু শাঁখা ও লোহা পরে থাকতে হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্র চুপ করিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—একটি দিনের জন্য চিনি তার শাশুড়ী ও ননদের বিরুদ্ধে, তার শ্বশুরের বিরুদ্ধে, তার অপদার্থ স্বামীর বিরুদ্ধে মুখ ফুটে অভিযোগ করেনি, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলেনি; আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে এমন করুণ, অসহায় ভাবে, নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে যে প্রশ্ন করে ওকে কষ্ট দিচ্ছি ভেবে নিজের মনে গ্লানি হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আদিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দ্র আবার

বলিল—জানিস আদি, ওর তিন বছরের ছেলেটাকে পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে আসতে দেয়নি, আমার চিঠি পেয়ে এক কাপড়ে ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আদিনাথ চুপ করিয়া ইন্দ্রের কথা শুনিতেছিল, কোন উত্তর দিল না। ইন্দ্র বলিল—এর কি প্রতিকার আছে আমাকে বল। এক রাগ করে চিনিকে শ্বশুরবাড়ী যেতে না দিতে পারি। কিন্তু চিনি তাতে রাজী হবে না, সুখী ত হবেই না। নিজের অবস্থাকে ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে সে চুপ করে সয়ে যায়। চিরকাল চুপ করে সয়ে যাওয়া ওর স্বভাব।

এইবার আদিনাথ কথা বলিল।

বলিল—দাদা, আমার দিদির স্বভাব ত ও রকম নয়। কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিয়েছে বলে দিদি তার স্বামীকে ঘৃণা করে। স্বদেশী ছেলেদের ধরিয়ে দেয় বলে, চাকুরির উন্নতির জন্য লোককে মিথ্যা স্বদেশীর মামলায়, বোমার মামলায় জড়াবার চেষ্টা করে বলে, সে অন্তর থেকে তার স্বামীকে ঘৃণা করে। স্বামীর ষড়যন্ত্রের কথা কিছু জানতে পারলে যেমন করে পারে লোককে সাবধান করবার চেষ্টা করে। নির্যাতনের প্রতিবাদ করে দিদি, সে বরাবর জেদী মেয়ে।

মানদার ব্যাপার লইয়া গ্রামে আন্দোলন আরম্ভ হইল। রাঘব ইন্দ্রের শরিকদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ইন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করিল। নালিশের মর্ম এই যে ইন্দ্র তাহার স্ত্রীকে অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আন্দোলনের ফলে রাজনগরের সমাজ দুই দলে ভাগ হইয়া গেল। বড় দলটি হইল ইন্দ্রের বিপক্ষে। তাহারা বলিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হইয়াছে, স্ত্রী রাগ করিয়া পলাইয়া ইন্দ্রের গৃহে উঠিয়াছে। ইন্দ্রের কর্তব্য তাহাকে বুঝাইয়া হউক, জোর করিয়া হউক স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া। রাঘব নালিশ করিলে ইন্দ্র আদালতে কি জবাব দিবে? ছোট দল বলিল রাঘবের উচিত বুঝাইয়া স্ত্রীকে ঘরে লইয়া আসা। তাহা না করিয়া সে বাড়ী বাড়ী নালিশ করিয়া বেড়াইতেছে কেন? ইন্দ্র আশ্রয় দিয়াছে। রাঘবের স্ত্রী আসিতে না চাহিলে সে কি গৃহস্থঘরের বৌকে জোর করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিবে?

আন্দোলন বাড়িয়া চলিল।

জীবানন্দ ইন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইন্দ্র আসিলে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহাকে অনেক কথা বলিলেন। যাহা বলিলেন তাহার সার মর্ম

এই যে রাজেনবাবু জীবানন্দের কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি আদিনাথ ও তাহার ভগ্নীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিলেন। বলিলেন আদিনাথ একজন গুণ্ডা প্রকৃতির অসচ্চরিত্র যুবক। সে তাঁহার বিধবা, অল্পবয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ফুসলাইয়া কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ভগ্নী এ বিষয়ে তাহার সাহায্যকারী। রাঘব বাড়ী আসিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাঘবকে গোপনে আদিনাথ ও তাহার ভগ্নীর কথা জানাইয়াছে, লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে কোন কথা জানায় নাই। রাঘব এ সম্বন্ধে তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অপরাধ অস্বীকার করিয়া জ্ঞানদার চরিত্রে দোষারোপ করিতে থাকে। ভগ্নীর চরিত্রে দোষারোপ করাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাঘব স্ত্রীকে দুই চারিটা কটু কথা বলিতে সে ভয়ে পলাইয়া ইন্দ্রের বাড়ীতে চলিয়া যায়। উঠিবার আগে রাজেনবাবু বলিলেন আমি ইন্দ্রকে স্নেহ করি। সে ভিতরের ব্যাপার জানেনা। আর আমিও পারিবারিক কেলেঙ্কারীর কথা বাহিরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। ইন্দ্রকে বলিবেন সে বৌমাকে যেন পাঠাইয়া দেয়, আর ঐ আদিনাথ ছোকরাটিকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে অতি দুষ্ট চরিত্রের লোক, শুধু স্বদেশীর ভড়ং করে।

ইন্দ্র তাহার শিক্ষক রাজেন বাবুর অভিযোগ শুনিয়া বুঝিতে পারিল এ সমস্ত রাঘবের রচিত কথা। সে পিতাকে যাহা বুঝাইয়াছে পুত্র স্নেহে অন্ধ বৃদ্ধ তাহাই বুঝিয়াছেন।

সে শ্বশুরকে বলিল—মাষ্টার মশায়কে রাঘব বাবু যা বলেছেন তিনি তাই বিশ্বাস করেছেন। তাঁর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে যা হোক, আমি মাষ্টার মশায়ের পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দিতাম কিন্তু রাঘব বাবু তাঁকে এমন অমানুষিক প্রহার করেছেন যে জ্বরে ও গায়ের ব্যথায় তিনি তিন দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। রজনী ডাক্তার মশায় দেখছেন। শুনলাম আজ জ্বর ছেড়েছে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে পাঠাবার চেষ্টা করব।

জীবানন্দ বলিলেন—হাঁ বাবা, তাই করো। এ গোলমাল মিটিয়ে ফেলা ভাল। রাঘব লোক ভাল নয়।

ইন্দ্র বলিল—আমি পাঠাবার চেষ্টা করব কিন্তু তিনি যদি ও বাড়ী যেতে অনিচ্ছুক হন আমি জোর করে পাঠাতে পারব না।

জীবানন্দ—কিন্তু—

ইন্দ্র—আদিনাথকে সঙ্গে দিয়ে আমি ওঁকে ওঁর মার কাছে পাঠিয়ে দেব। তারপর দু'পক্ষের যা করবার হয় তাঁরা করবেন।

ইন্দ্রের প্রস্তাব শুনিয়া জীবানন্দ আশ্বস্থ বোধ করিলেন। বলিলেন—এ দিকটা আমি ভাবিনি ইন্দ্র, আমার মনে হয়নি। রাঘব বড় খারাপ লোক বাবা, গাঁয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছে, তাই ভয় পেয়েছিলাম।

দিন কয়েক পরের কথা।

মানদার জ্বর বন্ধ হইয়াছে, তাহাকে ভাত দেওয়া হইয়াছে। আদিনাথকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র বিকালের দিকে জলযোগের জন্য অন্দরে আসিলে লক্ষ্মী বলিল —মানদা দিদিকে রাজী করাতে পারলাম না। আজ সারা দুপুর চিনি ও আমি তাঁকে নানাভাবে বোঝালাম। চিনি নিজের অবস্থার কথা বলে তাঁকে কত বোঝাল মেয়েদের শ্বশুর ঘর ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই। মানদা দিদি সব শুনে মাথা নেড়ে বললেন,—ও ছোটলোক কসাইয়ের ঘরে আমি আর যাব না। মা আছেন, ভাইরা আছে, তারা দু'টো খেতে দেয় ভাল, নইলে ভিক্ষে করে খাব, দাসীবৃত্তি করব। আমার কাছে সে ও ভাল।

—চিনি তবু তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল। তার কথা শুনে মানদা দিদি হেসে বললেন—তোমরা এত ভাবছ কেন ভাই আমি বুঝি না। সংসারে আমার সাধ আহ্লাদ সব শেষ হয়েছে, সংসারে ঘেন্না ধরেছে। আমার বাবার গোবিন্দজীকে তোমরা দেখনি। কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম গোবিন্দজী আমাকে ডাকছেন। দেখলাম মানুষ যেমন করে হাতছানি দেয় ঠিক তেমনি করে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। জেগে উঠে আমার মত তখনি ঠিক করে ফেললাম।

লক্ষ্মীর মুখে মানদার কথা শুনিয়া ইন্দ্রের মনে হইল সংসার সমুদ্রে যাহাদের নৌকাডুবি হইয়াছে তাহাদের একমাত্র আশ্রয় বুঝি এই নবদুর্বাদলশ্যাম কিশোর ঠাকুর। সে বুঝিল মানদাকে আর বুঝাইবার চেষ্টা করা বাহুল্য।

দিন তিনেক পরে রাজনগরে ইন্দ্রের সমালোচক মণ্ডলী ও প্রবল প্রতাপ রাঘব দারোগা শুনিয়া বিমূঢ় হইল আদিনাথ তাহার ভগ্নীকে লইয়া তারাপুরে চলিয়া গিয়াছে।

ইন্দ্র হিসাব করিয়া এই সংবাদ এমন সময় প্রচার করিল যখন পতিসরা ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া মহিষের গাড়ী ভাতুই নদী নৌকায় পার হইয়া তারাপুরের রাস্তায় পড়িয়াছে। দৌড়াইয়া গিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া মানদাকে ঘরে ফিরাইয়া আনা রাঘবের পক্ষে তখন আর সম্ভব নহে।

আদিনাথ যাইবার সময়ে সেবকাশ্রমের কাজের ভার ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিয়া গেল। ইন্দ্র বুঝিল সে আর ফিরিবে না। বুঝিলেও সে কোন প্রশ্ন করিল না, অন্যান্য বারের মত আদিনাথকে ফিরিবার অনুরোধ করিল না। মানদার ব্যাপারের পরে রাজনগরের হাওয়া এমন প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছিল যে আদিনাথের পক্ষে শান্তিতে কাজ করা সম্ভব ছিল না।

আদিনাথ যখন উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির মন লইয়া তাহার কাছে প্রথম আসিয়াছিল ইন্দ্রের বুঝিতে দেরি হয় নাই যে উপযুক্ত অন্য কর্ম্মক্ষেত্র না পাইলে সে বিপ্লবী পন্থা ধরিবে। সেবকাশ্রমের উদ্দেশ্য ও কাজের প্রণালীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া আদিনাথের হাতে সে আশ্রম চালাইবার ভার তুলিয়া দিয়াছিল। পুলিশের উৎপীড়নে, লোকের নির্বোধ বিরোধিতায় কাজ বার বার ব্যাহত হইলেও সে ছাড়ে নাই, যেমন করিয়া হউক সে কাজ চালাইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে আর ধরিয়া রাখা গেল না।

আদিনাথ চলিয়া যাওয়াতে ইন্দ্র মুষড়িয়া পড়িল। দেশের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহার বিমর্ষভাব আরও যেন বাড়িল। কোনদিকে একটু আশার আলোক তাহার চোখে পড়ে না এমন অবস্থা দেশের।

মর্লে-মিণ্টো রিফর্মস দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হাঙ্গামার বন্যা আনিয়াছে। পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের উৎপীড়নে দেশের লোক সন্ত্রস্ত, উৎকণ্ঠিত। কংগ্রেস দলীয় বিবাদের জের টানিতেছে। কারারুদ্ধ বালগঙ্গাধর তিলকের কণ্ঠ নীরব। একসট্রিমিষ্ট বাংলার নেতা অরবিন্দ ঘোষ নিরুদ্দেশ। যুগান্তর, বন্দে-মাতরমের বাণী স্তবধ, বিপিনচন্দ্র পাল আধ্যাত্মিকতা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

দেশে প্রকাশ্য আন্দোলনের আড়ালে যে গুপ্ত আন্দোলনের ধারা বহিতেছিল গভর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় ঢাকার অনুশীলন সমিতিভুক্ত পঞ্চান্নজন আসামীকে

ডাকাতি, হত্যা, যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অভিযোগে পুলিশ চালান দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চুয়াল্লিশজন আসামীকে লইয়া সেসন কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

সরকার পক্ষের কৌঁসিল প্যারীলাল রায় উদ্বোধনী বক্তৃতায় শক্তিপূজা ও শক্তিতন্ত্র হইতে আসামীরা কি ভাবে বাংলায় বিপ্লববাদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্যাস দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম বিশ্লেষণ করিয়া এই উপন্যাসগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে নূতন বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা তিনি আদালতকে শুনাইলেন তাহাতে দেশের লোক চমৎকৃত হইল। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া একখানি কাগজ লিখিল—বিজ্ঞ কৌঁসিলের বক্তৃতা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি বাংলা সাহিত্যের একখানি ভাল বইও সিডিশানের ব্যাসিলি হইতে মুক্ত নহে। খুঁজিলে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতেও সিডিশানের বীজাণু পাওয়া যাইতে পারে। আবশ্যক হইলে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রজনীকান্ত, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রামগতির রচনা হইতে, প্রত্যেকটি নামকরা বাঙ্গালী গ্রন্থকারের রচনা হইতে আপত্তিজনক বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ঢাকা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার কয়েকদিন পরে ত্রিনয়নী এক পত্র পাইলেন। পত্র পড়িয়া বিমর্ষ মুখে তিনি পত্র জীবানন্দের হাতে দিলেন। পত্র লিখিয়াছেন তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ। লিখিয়াছেন কয়েকদিন হইল তাঁহার একমাত্র পুত্র গঙ্গারামকে পুলিশ গেপ্তার করিয়াছে। বাড়ী তল্লাসী করিয়া পুলিশ নাকি ঢাকার অনুশীলন সমিতির কতকগুলি কাগজপত্র পাইয়াছে। ঢাকার মোকদ্দমার আসামীদের মধ্যে গঙ্গারামের নাম পাওয়া গেল।

মহারাষ্ট্রের পাণ্ডুহারপুরের একটি গৃহে তল্লাসীর ফলে রাজদ্রোহমূলক কাগজপত্র পাইয়া পুলিশ এক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা দায়ের করিল।

নাসিক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় বিনায়ক সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ সাভারকরের প্রতিষ্ঠিত "অভিনব ভারত সমিতির" বিস্তারিত কার্য্যকলাপের সংবাদ প্রকাশিত হইলে দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। মোকদ্দমায় আটত্রিশজন আসামীর মধ্যে সাতাশ জনের দণ্ড হইল।

ইহার পরে গোয়ালিয়রে "অভিনব ভারত সমিতির" উনিশজন এবং "নব

ভারত" নামে স্থানীয় বিপ্লবী সমিতির বাইশ জন সভ্যের বিচার হইল গোয়ালিয়র ষ্টেট ট্রিবুনালের নিকট। সকল আসামীর শাস্তি হইল।

সাতারায় ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা আরম্ভ হইল "অভিনব ভারত সমিতির" তিন সভ্যের বিরুদ্ধে।

বাংলায় বিঘাতি, রায়তা, মোরহাল, নেত্রা, হলুদবাড়ী ও অন্যান্য ডাকাতির সম্পর্কে পুলিশ পঞ্চাশজন আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিল। ইহাদের মধ্যে ছেচল্লিশ জন আসামী লইয়া হাওড়া গ্যাং কেস বা ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। আসামীরা শিবপুর দল, কুচি দল, খিদিরপুর দল, চিংড়িপোতা দল, মজিলপুর দল, হলুদবাড়ী দল, কৃষ্ণনগর দল, নাটোর দল, ঝাউগাছা দল, যুগান্তর দল, ছাত্র ভাণ্ডার দল ও রাজসাহী দল—এই বারোটি বিভিন্ন দলভুক্ত ছিল।

পর পর এতগুলি রাজনৈতিক মামলা দায়ের হওয়ায় দেশে উত্তেজনার অবধি রহিল না।

আদিনাথ চলিয়া যাইবার পর স্বামীর বিমর্ষভাব বাড়িয়াছে দেখিয়া লক্ষ্মী ভাবিয়া আকুল হয়।

বাস্তবিক লক্ষ্মীর ভাবনার অন্ত নাই। সে স্বামীর জন্য ভাবে, চিনির জন্য ভাবে, মানদার জন্য ভাবে।

কিসে চিনির চেহারা আগের মত হয়, তাহার আগের হাসিখুশী ভাব ফিরিয়া আসে লক্ষ্মী ভাবে। চিনির শুশ্রূষায় সে আপনাকে ব্যস্ত রাখিতে চেষ্টা করে।

চিনি তাহার ব্যস্ততায় রাগ করে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে তাহার গৃহিনীপনার বাড়াবাড়িতে, কিন্তু মনে মনে সে খুশী হয়। একদিন মনের উচ্ছ্বাস না চাপিতে পারিয়া বলিল—ভাই, মা বেঁচে থাকলেও তুই যেমন করছিস এমন আদর যত্ন পেতাম না। সংসারে একটা জুড়োবার জায়গা আমার বাঁধা রইল এ কথা জেনেও মনে শান্তি পাব।

মানদা কবে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু মানদার জন্য লক্ষ্মীর ভাবনা শেষ হয় নাই। এমন মা, এমন সব ভাই আছেন অথচ মানদা দিদির কপাল কত দুঃখের, স্বামীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা, ভালবাসা নষ্ট হইয়াছে। সংসারের সাধ আহ্লাদ বিসর্জন

দিয়া কি লইয়া তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন? যাইবার সময়ে তিনি গোবিন্দজীর কথা বলিলেন, কিন্তু মেয়ে মানুষের কৃষ্ণ বল, গোবিন্দ বল সবই ত স্বামী। একটু নরম হইয়া, মানাইয়া লইয়া স্বামীর সংসারে তিনি থাকিতে পারিতেন না?

লক্ষ্মী ইন্দ্রের জন্য ভাবে। তাহার স্বামী দেবতা। তাঁহার দেবতার মতই বিরাট, মহৎ হৃদয়। লক্ষ্মী আর কতটুকু মানুষ যে সেই বিরাট হৃদয়ের সবখানি ভরিবে? স্বামীর হৃদয়ে তাহাকে ধরিবার মত স্থান দিয়াও অনেকখানি ফাঁক থাকে। সেই ফাঁক ভরে দেশের কাজে, তাঁহার প্রিয় সেবকাশ্রমের কাজে। আদি ঠাকুরপো চলিয়া যাওয়ার পর হইতে তিনি সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন সেবকাশ্রমের কাজে। কিন্তু সে কাজে বাধার অন্ত নাই। গ্রামের লোক রাঘব বাবুর পক্ষে দাঁড়াইয়াছে। এত লোকের বিরুদ্ধতার সম্মুখে সেবকাশ্রম কি বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে? সম্ভব না হইলে স্বামী কি করিবেন? লক্ষ্মী তাহার এতটুকু হাত দিয়া অত বড় মানুষটিকে কি করিয়া আটকাইয়া রাখিবে?

লক্ষ্মী যে এত ভাবে তাহা সকলে বুঝিতে না পারিলেও লক্ষ্মীর সই কামিনী বৌ কিছু বুঝে। সে প্রায় রোজ আসে। হাসি গল্পে সে আসর জমাইয়া তোলে বিকালের দিকে।

তারাপুর হইতে আদিনাথের এক পত্র পাইল ইন্দ্র।

আদিনাথ লিখিয়াছি—দাদা, আপনাকে ও বৌদিকে আমার প্রণাম জানাইতেছি। আমার মন বড় অশান্ত হইয়াছে। আপনার কাছে থাকিতে পারিলে শান্তি পাইতাম। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম। শীঘ্রই কলিকাতা যাইতেছি দিদি ও মাকে লইয়া। দিদি গোবিন্দজীর পূজা অর্চনা লইয়া বেশ আছে, শান্তিতে আছে।

—আপনার সেবকাশ্রমের আদর্শ আমার মনে গাঁথিয়া রহিয়াছে। দেশের মধ্যে এই রকম আর একটা প্রতিষ্ঠানের খবর পাইলে সেখানে গিয়া কাজ করিতাম। কিন্তু রাঘব দারোগার জাত ভাইরা দেশের সর্বত্র আছেন, তাঁহাদের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। আপনার সেবকাশ্রমকে ঐ লোকটা শেষ করিবে আমার ভয় হয়।

—আমি একটা চাকুরি পাইয়াছি। একথা কাহাকেও জানাইনি, শুধু আপনাকে জানাইতেছি। ঢাকার সোনারং নেশনাল স্কুলে মাষ্টারীর চাকুরি। আমার এক বন্ধু জুটাইয়া দিলেন। দিদি ও মাকে কলিকাতা রাখিয়া আমি চাকুরিতে যোগ দিতে যাইব। আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হইবে কিনা ভগবান জানেন।

—বৌদিকে আমার কথা বলিবেন।

লক্ষ্মীকে আদিনাথের পত্র পড়িতে দিল ইন্দ্র।

পত্রখানি পড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী বলিল—আদি ঠাকুরপো সত্যিই আমাদের মায়া কাটালেন তাহলে।

ইন্দ্র বলিল—শুধু আমাদের নয়, তার নিজের মা, ভাইবোনের মায়াও কাটাল। ভগবান জানেন আর ওর সঙ্গে দেখা হবে কি না।

লক্ষ্মী—একথা বলছ কেন? আমাদের সবাইকে একেবারে ভুলে যাবেন তিনি?

ইন্দ্র একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিল—সে কোন পথে চলেছে বুঝতে পারছ না এখনও? যে পথ ফাঁসীকাঠ বা আন্দামানে পৌঁছে দেয়। এতদিন আমার সেবকাশ্রম ওর হাতে তুলে দিয়ে ওকে ধরে রেখেছিলাম, আর ধরে রাখা গেল না।

কিছুদিন কাটিয়া গেল।

রাজা পঞ্চমজর্জ্জ ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিবেন ও দিল্লীতে অভিষেক দরবার হইবে স্থির হইয়াছিল। তাঁহার আগমনের সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে গুজব রটিল বঙ্গ ভঙ্গের আদেশ রদ হইবে। সংবাদ পত্রে, লোকের মুখে মুখে গুজব ছড়াইতে লাগিল। এই গুজব সম্পর্কে বাংলার বিপ্লববাদের প্রসঙ্গ তুলিয়া একখানি কাগজ লিখিল—"পার্টিশান রদ হইলেই কি বাঙালীরা সন্তুষ্ট হইবে? আমরা বলিব, না। এশিয়াবাসীর প্রাণে যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়াছে তাহার ফলে বর্তমান আন্দোলন বন্ধ হইবে না বলিয়া মনে হয়।"

অনেক কাগজে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের সম্ভাবনায় আনন্দোচ্ছাস প্রকাশিত হইল। উচ্ছাসের বাড়াবাড়ি দেখিয়া ইন্দ্র নিজের মনে হাসিল।

সে ভাবিল কোথায় ১৯০৫ আর কোথায় ১৯১১? কবে বঙ্গভঙ্গ আদেশের প্রতিবাদে সভা সমিতি, বক্তৃতা ও রেজোল্যুশনের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। সভা সমিতি বক্তৃতার অধ্যায় শেষ হইল, বিদেশী বয়কট ও স্বদেশী গ্রহণ, জাতীয় বিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা, জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার অধ্যায় শেষ হইল, বয়কট আন্দোলন ভাঙ্গিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান বিবাদের প্ররোচনা, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বন্ধ করিবার জন্য লাঠিবাজি, ছাত্র দলন, বরিশাল কন্‌ফারেন্সে এন্টি-সারকুলার সোসাইটির সভ্যদের মাথা ভাঙ্গা—কবে এসব অধ্যায় শেষ হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব কি বয়কট-বিদ্বেষী মেটা, গোখেলের হাতে রহিয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন? বঙ্গভঙ্গ রদের দাবি অতিক্রম করিয়া জাতির দাবি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, সভা সমিতির আন্দোলন ছাড়িয়া জাতির আন্দোলন অন্য পথ ধরিয়াছে। মেটা-গোখেল-সুরেন্দ্রনাথের যুগ চলিয়া গিয়াছে, উপাধ্যায়-অরবিন্দ-বিপিন পালের যুগ চলিয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কি মনে করেন বঙ্গভঙ্গ রদ করিলে উদ্যতপ্রহরণ নূতন পথের অভিযাত্রীদল অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া রাজভক্তির পতাকা উড়াইবে?

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—যে বঙ্গ-ভঙ্গের জন্য এত কাণ্ড তাই যখন রদ হচ্ছে সরকার কি দাদাকে ছেড়ে দেবে না? কত লোক জেলে পচছে তাদের ছেড়ে দেবে না?

লক্ষ্মীর প্রশ্নে ইন্দ্র হাসিল। বলিল—আমাদেয় সঙ্গে একটা আপোষ করবার জন্য ইংরেজ ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দিচ্ছে ভাবছ নাকি? সে সদিচ্ছা তাদের বিন্দুমাত্র নেই। তাদের খেয়ালে বাংলা ভেঙ্গেছিল, তাদের খেয়ালে আবার জোড়া দিচ্ছে।

লক্ষ্মী তবু বলে—সত্যি বলছ দাদা ছাড়া পাবেন না? মা বলছিলেন হয়ত দরবারের পর বন্দীদের মুক্তি ঘোষণা করা হবে।

ইন্দ্র আবার একটু হাসিল, বিষণ্ণ হাসি।

রাজেন বাবু সেদিন সকালের দিকে একখানি চিঠি হাতে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে জীবানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। চিঠিখানি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—রাঘব লিখেছে সম্রাটের আগমন উপলক্ষ্যে তাহাকে রায় সাহেব খেতাব দিবার জন্য পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গভর্ণমেণ্টের কাছে সুপারিশ করিয়াছেন।

তারপর বলিলেন—বৌমাকে পাঠাবার জন্য আমি তার মাকে লিখব ভাবছি। দরবারের পরে রাঘব ছুটি নিয়ে বাড়ীতে আসবে লিখেছে। ছেলে রায়সাহেব হয়ে বাড়ী আসবে আর ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবে না এ কেমন কথা ? আপনি কি বলেন রায়বাহাদুর ?

জীবানন্দ তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

জীবানন্দের মুখে ইন্দ্র মানদাকে পাঠাইবার জন্য রাজেন বাবুর প্রস্তাবের কথা শুনিল। শুনিয়া সে ভাবিল এত কাণ্ডের পর তাহার মা ভাইরা কি মানদাকে আবার এখানে পাঠাইবে ? মানদা আসিতে চাহে না, জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইবার ফল কি ভাল হইবে ? শ্বশুরের কথার উত্তরে সে ভাল মন্দ কোন কথা বলিল না।

বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে দিল্লীতে করোনেশন দরবার বসিল।

১২ই ডিসেম্বর, ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গভঙ্গ রদের আদেশ ঘোষণা করা হইল।

১৪ই ডিসেম্বর তারিখে তারকচন্দ্র পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ক্ষীরোদবিহারী দত্ত, আবদুল রসুল, অম্বিকাচরণ মজুমদার, আনন্দচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর স্বাক্ষরে যুক্ত বাংলার অধিবাসীদের নিকট এক আবেদন প্রচারিত হইল—"আমরা অবগত আছি যে আগামী ১৭ই ডিসেম্বর প্রতি গ্রামে ও শহরে বিভক্ত বঙ্গের দুই অংশ আবার মিলিত হওয়া উপলক্ষ্যে উৎসব দিবস রূপে পালন করা হইবে। এই উৎসবে পূজা ও প্রার্থনা, সংকীর্তন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, দরিদ্র বিদায় ও প্রতি গৃহে আলোক সজ্জা করিতে হইবে।"

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার সংবাদ প্রচারিত হইল।

মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আদেশে অসন্তুষ্ট হইলেন। রাজা কলিকাতায় আসিলে মুসলমান-প্রধান পাড়াগুলিতে গৃহে আলোকসজ্জা করা হইল না।

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায় দাবি করিলেন সকল শ্রেণীর চাকুরির অর্ধেক তাঁহাদিগকে দিতে হইবে, শিক্ষার খাতে সমগ্র ব্যয়ের অর্ধেক তাঁহাদের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে, আইনসভা, জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যদের শতকরা ৫০টি আসন তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশরূপে ঘোষণা করিয়া গভর্ণমেণ্ট জানাইলেন "Administrative Purpose"এ বাংলার যে সকল জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বাংলাকে সেগুলি ফিরাইয়া দিবার কথা পরে বিবেচনা করা হইবে।

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল।

অনেক চেষ্টায় বিমর্ষভাব ও নিশ্চেষ্টতা কাটাইয়া ইন্দ্র আবার নূতন উদ্যমে সেবকাশ্রমের কাজ আরম্ভ করিল। কর্মব্যস্ত স্বামীর দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিল।

কিন্তু বেশীদিন এই নিশ্চিন্তভাব থাকিল না।

হঠাৎ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের একখানি নোটিশ ইন্দ্রের হস্তগত হইল। আপত্তিজনক কার্যে নিযুক্ত আছে এই হেতুতে রাজনগরের সেবকাশ্রম নামক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে, অবিলম্বে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিতে হইবে।

নোটিশ পাইয়া ইন্দ্র বসিয়া পড়িল। আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া যে সেবকাশ্রম সে চালাইয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে অযথা, অন্যায় করিয়া এইভাবে তাহা ধ্বংস করা হইল। নোটিশ পাঠাইবার আগে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ডাকিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করা পর্যন্ত আবশ্যক মনে করিলেন না। সেবকাশ্রমের বাড়ীতে তালা লাগাইতে হইল।

সেবকাশ্রমের বাড়ীতে তালা লাগাইয়া ইন্দ্র ভাবিল রাজনগর ছাড়িয়া এইবার

বাহিরে কিছুদিন কাটাইয়া আসিবে, রাজনগরে আর ভাল লাগিতেছিল না। এ বিষয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে পরামর্শ করিবে ভাবিতেছে এমন সময় কলিকাতা হইতে ব্রজনাথের একখানি পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে—আদির কোন খবর পাইয়াছেন কি আপনি? মা ও মানদাকে এখানে রাখিয়া তারাপুরে ফিরিয়া যাইবার পর হইতে তাহার আর কোন খবর পাই নাই আমরা। মা আর কলিকাতা থাকিতে চাহিতেছেন না, তারাপুরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। মা ও মানদাকে লইয়া কয়েকদিনের মধ্যে আমি তারাপুরে যাইতেছি। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু যাইতেছেন, অভিপ্রায় আমাদের দেশ দেখিবেন। তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রিওয়ালা পণ্ডিত লোক, আপনার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম। আশা করিতেছি আপনি কোন সময়ে কলিকাতা আসিলে সে সুযোগ হইবে।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে ব্রজনাথের চিঠি দেখাইল।

চিঠি পড়িয়া লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর সাগ্রহে বলিল—ব্রজবাবুকে লিখবে তাঁর বন্ধুকে নিয়ে রাজনগরে দু'একদিন বেড়িয়ে যেতে?

প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দ্র একবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিল তাহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য। একটু হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি আজই লিখছি ব্রজবাবুকে।

স্বামীর নিঃসঙ্গতা দূর করিবার একটা উপায় পাওয়া গেল ভাবিয়া লক্ষ্মী একটু খুশীমনে অন্দরে গেল।

ব্রজনাথকে চিঠি লিখিবার জন্য ইন্দ্র নিজের ঘরের দিকে চলিল। সে ভাবিল তাহার নিঃসঙ্গতা দূর করিবার জন্য, তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য লক্ষ্মীর চেষ্টার অন্ত নাই, কিন্তু তাহার মনের শূন্যতা কি সহজে দূর হইবে?

ব্রজনাথ ও তাহার বন্ধুকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইয়া ইন্দ্রের পত্র সেই দিনই ডাকে রওনা হইয়া গেল।

দিন দশ পরে ব্রজনাথ ও তাহার বন্ধু তারাপুর হইতে রাজনগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইন্দ্র পরম সমাদরে উভয়কে অভ্যর্থনা করিল।

ব্রজনাথ বন্ধুর পরিচয় দিয়া বলিল—ইনি বীরেন্দ্র দেব, কলেজের অধ্যাপক। কলিকাতা ইউনিভারসিটির ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র, প্যারিস ও বার্লিন ইউনিভারসিটির

ডক্টর। অর্থাৎ দুর্ধর্ষ পণ্ডিত লোক। অধ্যাপকের চাকুরি সৌখীন পেশা, গোটা পাঁচ কয়লার খনির মালিক ইঁহার পিতা। কলিকাতায় বাড়ীর সংখ্যা—

বাধা দিয়া বীরেন্দ্র বলিল—থাক্, আর বাড়াবেন না ব্রজবাবু। আমার পিতার বিত্ত যতই হোক আমি কলেজের মাষ্টার মাত্র। আপনার পরিচয় আমি জানি ইন্দ্রবাবু, ব্রজবাবুর মুখে আপনার কথা শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। উনি আপনার কত বড় এডমায়ারার আপনি বোধহয় জানেন না। ওঁর একদিনের কথা মনে পড়ছে। আপনার কথা উঠলে ব্রজবাবু আপনার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললেন—Were I woman I would have begged for his love on my knees. (আমি মেয়ে হ'লে হাঁটু গেড়ে ওঁর প্রেম যাচ্ঞা করতাম)।

কথাটা বলিয়া বীরেন্দ্র হাসিতে লাগিল। ইন্দ্রও তাহার কথা শুনিয়া হাসিল।

হাসি থামাইয়া বীরেন্দ্র বলিল—ব্রজবাবুর মুখে আপনার কথা শুনে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে—

ইন্দ্র বলিল—আপনারা এসেছেন এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ব্রজবাবু আমার পুরাতন বন্ধু, ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক। কিন্তু আপনার মত একজন পণ্ডিত—

বীরেন্দ্র বলিল—দুর্ধর্ষ পণ্ডিত বলুন।

তাহার কথা শুনিয়া ব্রজনাথ ও ইন্দ্র হাসিল।

ইন্দ্র ও ব্রজনাথের মধ্যে আদিনাথের কথা আলোচনা হইল। আদিনাথ চিঠিতে ইন্দ্রকে যাহা লিখিয়াছিল তাহার মর্ম ব্রজনাথকে জানাইল। শুনিয়া ব্রজনাথ বলিল—হয়ত ওর মন নানা কারণে অস্থির হয়েছে। একটু ঠাণ্ডা হলে বাড়ীতে না ফিরুক আপনার কাছে ও ফিরে আসবে। আপনাদের দু'জনকে আদি বাড়ীর লোকের চাইতে বেশী ভালবাসে।

ইন্দ্র এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না।

ইন্দ্রের গৃহে সেদিন সান্ধ্য আসর জমিয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রের গৃহে গল্প-গুজবে কাটাইবার জন্য যাঁহারা সাধারণতঃ আসেন তাঁহারা সকলেই আসিলেন। রাজেনবাবুও আসিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন বড় আলোচ্য বিষয় "বলকান ক্রাইসিসের" কথা উঠিল।

শরৎ পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে বলকান ক্রাইসিসের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বীরেন্দ্র বলিল—বলকানের ব্যাপার নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হবার বিশেষ কারণ না থাকলেও এদেশের মুসলমানরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তুর্কীর সাম্রাজ্য যায় দেখে।

শরৎ পণ্ডিত—কাগজ পড়ে মনে হয় তাঁরা সরকারের ওপর গোঁসা করেছেন ও হিন্দুদের কোল দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। এর রহস্য একটু ব্যাখ্যা করুন।

ব্রজনাথ বলিল—তাহলে ইতিহাসের কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। এ দেশের মুসলমানরা চান বলকান যুদ্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তুর্কীকে সাহায্য করুন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কতদূর সাহায্য করবেন তা রুশো-তুর্ক যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, তারপর ত্রিপোলী যুদ্ধের সময়েও দেখা গিয়েছে।

—১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে রুশো-তুর্ক যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত না করে ব্রিটেন নিরপেক্ষ রইল। তারপর যুদ্ধের শেষে বার্লিন কনফারেন্সে রুশিয়ার সঙ্গে গোপন বন্দোবস্তের ফলে তুর্কীর অধিকারভুক্ত সাইপ্রাস দ্বীপ জবর দখল করে নিল। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে যে প্রহসন বারবার অভিনীত হয়েছে সেই প্রহসনের প্রথম অভিনয় দেখা গেল এই যুদ্ধের সময়ে। তুর্কীকে সাহায্য করবার জন্য হিন্দুদের আন্দোলন আরম্ভ হল। যশোরে হিন্দুরা এক সভা করে তুর্কীদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুললেন। হিন্দু সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা তুর্কীর প্রতি হিন্দুদের সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন।

—১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইটালী তুর্কীর অধিকারভুক্ত ত্রিপোলী আক্রমণ করল। এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় আবার ব্রিটেনের কাছে যুদ্ধে তুর্কীকে সাহায্য করার আবেদন করলেন। তাঁরা মনে করলেন কংগ্রেসের ও হিন্দুদের জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করবার পুরস্কার স্বরূপ পৃথক নির্বাচনের অধিকার পেয়ে তাঁদের "পোলিটিকেল ইম্পরটান্স" এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে ব্রিটেন তাঁদের

আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারবে না। কিন্তু তাঁদের সকল আবেদন নিবেদন ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ব্রিটেন নিরপেক্ষ রইল।

—তখন হতাশ ও ক্রুদ্ধ এদেশের মুসলমান নেতাদের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম জেগে উঠল। স্মরণ শক্তির দুর্বলতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুরা এই ভ্রাতৃপ্রেমের আবেদনে সাড়া দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করলেন না। পৃথক নির্বাচন দাবি করবার সময়ে মুসলমান নেতাদের হিন্দু-বিদ্বেষী উক্তি, পেশোয়ার, বোম্বাই, ত্রিহুত, কলিকাতার দাঙ্গার কথা, আফজল খাঁ ও বিন কাশেম উৎসবের কথা হিন্দুদের মন থেকে মুছে গেল।

—ফেডারেশন হলের মাঠের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভায় ইটালীয়ান জিনিস বয়কট করবার প্রস্তাব করা হল। রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করবার জন্য হিন্দু কাগজগুলি আবেদন করল। ভ্রাতৃপ্রেমের আবেগে বেঙ্গলী লিখল—"আমরা আশা করছি এই যুদ্ধের ফলে প্যান-ইসলামিক আন্দোলন আরও প্রবল হবে।" প্যান-ইসলামিক আন্দোলন প্রবল হলে তাতে হিন্দুদের আহ্লাদিত হবার হেতু আছে কিনা সেটুকু বোঝবার মত রাজনৈতিক বুদ্ধি তখনও হিন্দুদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি।

—শুধু অর্থ সাহায্য করা নয় হিন্দু নেতা তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর ত্রিপোলীতে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবার প্রস্তাব করলেন।

—আজকের এই বলকান যুদ্ধের সময়েও সেই পুরনো প্রহসনের নূতন অভিনয় হচ্ছে। সেদিন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলেজ স্কোয়ারে এক সভায় য়ুরোপীয় জিনিস বয়কট ও হিন্দু মুসলমানের একতা ঘোষণা করে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বললেন—"হিন্দুরা মুসলমানদের ভাই, বন্ধু ও অবলম্বন। হিন্দুরা ইসলামের বিপদের সময়ে সাহায্য করেছেন, মুসলমানদের কর্তব্য তাঁহাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।"

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—এছাড়া হিন্দুদের মনে লাগে এমন প্রচার কার্যও তাঁরা সুরু করেছেন। য়ুরোপ দিনের পর দিন এশিয়া গ্রাস করছে এই কথা তুলে "হাবলুল মাতিন" নামে ফার্সী ভাষার কাগজখানা পৃথিবীর সকল অশ্বেত জাতিকে য়ুরোপের শ্বেত জাতিগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার জন্য

এণ্টি-হোয়াইট সোসাইটি গড়ে তোলবার ধ্বনি তুলেছে। টোকিও থেকে ভারতীয় মুসলমানদের পরিচালিত প্যান-ইসলামিক জার্নাল এদেশে গোপনে বিলি হচ্ছে। এদিকে আল মামুন সুরাবর্দী সাহেব গীতার শ্লোক—

হতো বা প্রাপ্স্যামি স্বর্গম্ জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীং
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ

উদ্ধৃত করে প্রবন্ধ লিখেছেন—"প্রাচ্য জগতের নিকট একটি নিবেদন।" এই নিবেদনে তিনি লিখলেন—"বলকান যুদ্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংগ্রাম। কনষ্টান্টিনোপোলের পতনের সঙ্গে প্রাচ্যের শেষ কীর্তিস্তম্ভ পাশ্চাত্যের উচ্চাশার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। এশিয়ার গৌরব-রবি চির-অস্তমিত হইবে।" মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কাগজ "আল হিলাল" য়ুরোপকে রুখবার জন্য প্যান-এশিয়াটিক সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব করেছে।

ইন্দ্র বলিল—এমন চটকদার আবেদনে হিন্দুরা কি সাড়া না দিয়ে পারে?

ব্রজনাথ বলিল—সোজা কথা এই যে এশিয়াটিক জাত বলে তুর্কদের সম্বন্ধে হিন্দুদের মনে যে সহানুভূতি আছে সেই সহানুভূতিকে এক্সপ্লয়েট করে, মানে ভাঙ্গিয়ে, মুসলমানরা নিজেদের আন্দোলনকে প্রবল করতে চাইছেন।

রজনী ডাক্তার বলিলেন—হিন্দু নেশনালিষ্টরা কোন মোক্ষ লাভের আশায় মুসলমানদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুর্কীর জন্য কাঁদছেন বুঝতে পারলাম না।

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—মোক্ষ লাভের আশার কথা যদি বলেন তাহলে বলব মুসলমানদের নিজেদের দলে আনবার আশা। সরকারের বিরুদ্ধে একটা যুক্ত আন্দোলন দাঁড় করাবার জন্য হিন্দু নেশনালিষ্টরা মুসলমানদের সঙ্গে হাত মেলাতে চান।

বলকান সমস্যা ছাড়িয়া আলোচনা অন্যপথ ধরিল। কিছুক্ষণ পরে রাজেন-বাবু উঠিলেন। বৈঠকখানা দালানের বারন্দায় এককোণে রক্ষিত লণ্ঠনের সলিতা উসকাইয়া দিয়া লাঠিগাছা হাতে লইয়া তিনি সিঁড়িতে নামিতে গিয়া আবার ফিরিলেন। ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—ব্রজনাথ, কাল একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো, বিশেষ প্রয়োজন আছে। ব্রজনাথ বলিল—আচ্ছা।

পরদিন ইন্দ্র বীরেন্দ্র ও ব্রজনাথকে সঙ্গে লইয়া টোল পাড়ায় জীবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল।

জীবানন্দ সাদরে উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন—আমি আপনাদের খবর পেয়েছি। বীরেন্দ্রবাবু যে কষ্ট স্বীকার ক'রে এই পাড়াগাঁয়ে এসেছেন—

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—এই কথাটা আরও কয়েকজন আমাকে বলেছেন রায়বাহাদুর। কথাটা শুনে শুনে মনে হচ্ছে নিজের দেশে ঘুরে বেড়ানোটা কীর্ত্তি অর্জনের একটা বড় সহজ উপায়।

জীবানন্দ তাহার কথা শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন—বসুন আপনারা। বীরেন্দ্রবাবুর কাছে কিছু বিদেশের কথা শুনতে চাই।

আলাপ জমিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবু, আমি একবার চটকরে মানদার শ্বশুরবাড়ী থেকে ঘুরে আসছি। ওবেলা আপনাদের বিলে নৌবিহারের প্রোগ্রাম আছে না?

ইন্দ্র বলিল—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, সঙ্গে লোক দিই।

ব্রজনাথ—লোক দরকার হবে না। আপনাদের গ্রামের পথঘাট কিছু জানা আছে, আমি ফিরে এখানেই আসব।

সে সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিতে লাগিল।

ইন্দ্র ব্রজনাথের পথঘাট জানার কথায় আশ্বস্ত না হইয়া তাহার শ্যালক উমানন্দকে ডাকিয়া ব্রজনাথের সঙ্গে যাইবার জন্য বলিবে ভাবিয়া ব্রজনাথের অনুসরণ করিল।

ব্রজনাথ নীচে নামিয়া বাহিরে যাইবার জন্য সিঁড়ির পাশের ঘরে ঢুকিতে গিয়া অপ্রস্তুত ভাবে থামিয়া গেল। সরস্বতী অন্যমনস্কভাবে কি একটা হাতে লইয়া আসিতেছিল। দরজার কাছে আসিতে ব্রজনাথেব ঠিক সম্মুখে পড়িয়া থামিয়া গেল এবং পর মুহূর্তে সরিয়া ঘরের এককোণে গিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজনাথ ইন্দ্রের দিকে ফিরিয়া লজ্জিতভাবে বলিল,—আবার বড় অন্যায় হয়েছে এভাবে নেমে আসায়।

তাহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র একটু হাসিল। সে ডাকিল—সরী, এদিকে এসো।

ব্রজনাথ দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রের আহ্বানে সরস্বতী নতমুখে বাহিরে আসিল। ইন্দ্র বলিল—ব্রজবাবুকে প্রণাম করো।

সরস্বতী আদেশ শুনিয়া ব্রজনাথকে প্রণাম করিয়া ইন্দ্রকে প্রণাম করিল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—আনন্দ কোথায়?

উমানন্দ ভিতরের আঙিনায় ফুল গাছের পরিচর্যা করিতেছিল। সরস্বতী বলিল—তাকে ডেকে দেব?

ইন্দ্র—ডেকে দাও ত। ওকে ব্রজবাবুর সঙ্গে রাজেনবাবুর বাড়ী যেতে হবে।

সরস্বতী চলিয়া গেল। একটু পরে উমানন্দ লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ইন্দ্রকে বলিল—বাঃ, আপনি কখন এলেন?

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, ব্রজনাথকে দেখিয়া থামিয়া গেল।

ইন্দ্রের উপদেশ পাইয়া উমানন্দ ব্রজনাথের সঙ্গে রাজেন বাবুর বাড়ীতে চলিল। উমানন্দকে সঙ্গে লইয়া ব্রজনাথ যখন রাজেনবাবুর গৃহে পৌঁছিল একটি অল্পবয়েসী বিধবা তখন বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্রজনাথ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মেয়েটি চলিয়া গেল। তাহার চাহনি ব্রজনাথের ভাল লাগিল না।

উমানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল—উনি কে?

উমানন্দ বলিল—ও তো জ্ঞানদা দিদি, মাষ্টার মশায়ের ভাইঝি। জানেন, সকলে বলে জ্ঞানদা দিদি বড় দজ্জাল।

ব্রজনাথ কি ভাবিয়া বলিল—আনন্দ, তুমি এবার বাড়ী যাও। রাজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে আমি তোমাদের বাড়ী যাব। ইন্দ্রবাবুকে ব'লো আমার ফিরে যেতে অসুবিধে হবে না।

ছুটি পাইয়া উমানন্দ চলিয়া গেল।

রাজেনবাবুর "প্রয়োজন" সম্বন্ধে ব্রজনাথ যে অনুমান করিয়াছিল তাহা সত্য প্রমাণিত হইল। কড়া স্বরে তিনি কৈফিয়ৎ চাহিলেন কেন বৌমাকে পাঠাইবার জন্য তিনি নিজে পত্র দেওয়া সত্ত্বেও তাহাকে পাঠান হয় নাই এতদিন?

আদিনাথের মুখে মানদার শ্বশুরগৃহ হইতে ইন্দ্রের গৃহে পলায়নের কাহিনী ব্রজনাথ শুনিয়াছিল। আদিনাথ তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিল —দিদিকে আর ও বাড়ী পাঠাবেন না দাদা। কশাই দারোগা আর তার বদমায়েস বোন মিলে দিদিকে মেরে ফেলবে যদি পাঠান। দিদির মন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। পুজো অর্চনা নিয়ে শান্তি পেতে চায় সে, সেই শান্তি পেতে দিন তাকে। মার মনের ভাব অন্য রকম। তাঁর কথা শুনে দিদির অনিচ্ছায় তাকে পাঠাবেন না।

রাজেনবাবুর প্রশ্নে ব্রজনাথ সংক্ষেপে উত্তর দিন—সে নিজে যখন আসতে চাইবে তাকে পাঠাব।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজেনবাবু তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রজনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—সে এখানে যে ব্যবহার পেয়েছে তার পরেও বড় ভাই হয়ে তাকে জোর করে এখানে পাঠাব এই আশা করেন আপনি ?

রাজেনবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ব্রজনাথ তাঁহার গৃহত্যাগ করিল।

ব্রজনাথ যখন ফিরিয়া আসিল তখনও তাহার মানসিক উত্তেজনা শান্ত হয় নাই। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া ইন্দ্র ও জীবানন্দ বুঝিলেন মানদার ব্যাপার লইয়া অপ্রীতিকর আলোচনা হইয়াছে ব্রজনাথ ও রাজেনবাবুর মধ্যে।

বীরেন্দ্র পূর্বের আলোচনার জের টানিয়া বলিল—লণ্ডনের মুসলিমলীগ কমিটির সভায় আমিরআলি সাহেব হিন্দুদের সঙ্গে মিটমাটের প্রস্তাব করেছেন। হিন্দুরা এই প্রস্তাব লুফে নেয়নি দেখে মিঃ মহম্মদ আলি চটে গিয়েছেন।

—আসল ব্যাপার এই যে নিজেদের আন্দোলন জোরদার করবার জন্য মুসলমান নেতারা একটা মিটমাটের প্রস্তাব তুলেছেন। প্রস্তাবের রাজনৈতিক দিকটা এই রকম—আমরা ইংরেজের কাছে তোমাদের আন্দোলনের বিরোধিতা করবার ককসিস হিসাবে যে পৃথক নির্বাচনের অধিকার পেয়েছি তা ছাড়ব না। তোমাদের একটি দাবিও মানব না, তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন—আপনি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন নূতন আঁতাতের প্রচেষ্টার।

একজন ঝি ঘরে ঢুকিয়া মেঝেতে জল ছিটাইয়া হাত দিয়া মুছিয়া লইল। তারপর তিনখানি আসন পাতিয়া তিনগ্লাস জল রাখিয়া চলিয়া গেল। তিনখানি পাথরের রেকাবে নানা রকম খাবার সাজাইয়া সরস্বতী ও আনন্দ ঘরে আসিল।

আয়োজন দেখিয়া বীরেন্দ্র বলিল—সকালে ইন্দ্রবাবুর গৃহিণী যে আয়োজন করেছিলেন তার ওপর এই নূতন আয়োজন আমাদের কলকাতার পেটে বিপ্লব ঘটাবে।

জীবানন্দ বলিলেন—ঘরে তৈরী সামান্য জিনিস। বসুন আপনারা।

উমানন্দ সিঁড়ির পাশে ভিতরের দিকের ঘরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—আচ্ছা ছোড়দি, কলকতার পেটে বিপ্লব ঘটাবে মানে কি? কলকাতা ত একটা জায়গা, তার আবার পেট আছে না কি?

জলযোগ শেষ করিয়া বীরেন্দ্র, ব্রজনাথ ও ইন্দ্র বিদায় লইল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া সরস্বতী বলিল—চুপ, চুপ, ওঁরা শুনতে পাবেন।

পরের দিন ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্র কলিকাতা ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবু, এবার আপনি কয়েকদিনের জন্য কলকাতা আসুন; অবশ্য সস্ত্রীক। আমার বাড়ীতে এখন আমি ও আমার ছোটভাই সোমনাথ ছাড়া আর কেউ নেই। যথেষ্ট জায়গা আছে, কোন অসুবিধে হবে না আপনাদের। বলুন কবে যাবেন?

বীরেন্দ্র ব্রজনাথের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিল—দিন কয়েক জমিদারী চাকুরি থেকে ছুটি নিন না ইন্দ্রবাবু। কলকাতায় তিনজন মিলে নিশ্চিন্তে আড্ডা জমানো যাবে।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—যাবার ত ইচ্ছে আছে খুব, হয়ে উঠছে না। আপনাদের সঙ্গ আকাঙ্খার বিষয়। দেখি কত শীঘ্র ব্যবস্থা করতে পারি।

৮

নানা কাজকর্মে, ভাবনা চিন্তায় কয়েকটি মাস কাটিয়া গেল।

লক্ষ্মীকে লইয়া ইন্দ্রের বাহিরে কিছুদিন ঘুরিয়া আসিবার সঙ্কল্প যখনই কার্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হয় তখনই একটা না একটা বাধা উপস্থিত হয়। কয়েকবার এই কাণ্ডের পর ইন্দ্র কোথাও যাইবার কথা বলিলে লক্ষ্মী হাসিত। তাই ইন্দ্র স্থির করিল এবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবার ঠিক আগে লক্ষ্মীকে জানাইবে।

লক্ষ্মীর কাছে ইন্দ্র একদিন সংবাদ পাইল মানদাকে সঙ্গে লইয়া শরৎসুন্দরী তারাপুর হইতে রাজনগরে আসিয়াছিলেন, মানদাকে শ্বশুরের গৃহে রাখিয়া পরদিন চলিয়া গিয়াছেন।

ইন্দ্র অনুমান করিল মানদাকে আদিনাথের সঙ্গে সে তারাপুরে পাঠাইয়াছিল, শ্বশুরের গৃহে পাঠায় নাই এজন্য শরৎসুন্দরী বোধ হয় তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেই জন্য তাহার গৃহে এবার আর আসেন নাই।

ইন্দ্র ভাবিল মানদা কি তাহা হইলে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছে? আদিনাথের পত্রের কথা তাহার মনে হইল। শরৎসুন্দরী যে জোর করিয়া মানদাকে নিজের সঙ্গে আনিতে পারেন এমন কথা তাহার মনে আসিল না, সে ভাবিল হয়ত নানা দিক ভাবিয়া মানদার পূর্বের মতের বাস্তবিক পরিবর্তন হইয়াছে।

ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্রের তারাপুরে আসিবার সময়ে মানদাকে সঙ্গে লইয়া শরৎসুন্দরী গ্রামে ফিরিয়াছিলেন।

ব্রজনাথ কলিকাতা ফিরিবার সময়ে জোতখামারের ধান্য উঠান, খাজানা আদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈষয়িক কর্মের অজুহাতে তিনি তারাপুরে রহিয়া গেলেন। ব্রজনাথ জানিত এসব কাজের বিলি ব্যবস্থা অন্য কাহারও চাইতে তাহার মা ভাল পারেন। কাজেই সে আপত্তি করিল না, শুধু বলিল—মাস দুই পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে, তার বেশী নয়।

শরৎসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—তার আগেই তোকে চিঠি লিখব নিয়ে যাবার জন্য।

ব্রজনাথ চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে তাঁহার গোপন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল।

মানদা নিজেও তাঁহার এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে আগে হইতে কিছুমাত্র আভাস পায় নাই। যখন তিনি নিজে একবার রাজনগরে গিয়া মানদার শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন সে ইহার প্রথম আভাস পাইল। কয়েকদিন পরে তিনি মানদাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মানদা দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—ও ঘরে আমি আর ফিরব না।

শরৎসুন্দরী নানা রকমে বুঝাইয়া মেয়েকে রাজী করাইবার চেষ্টা করিলেন। সে যখন কোনমতে রাজী হইল না অবিশ্রান্ত গালিগালাজ ও কটু ভর্ৎসনায় তিনি তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। স্বামীর ঘরে যাইতে চাহে না এমন মেয়েকে পেটে ধরিয়াছিলেন বলিয়া মানদাকে শুনাইয়া নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মেয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করিতেন, বাজে ছুতায় অনশন করিতেন। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পরে মানদার কাছে জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল। কোন দিকে কুল না পাইয়া অবশেষে সে হাল ছাড়িয়া দিল। ভাবিল নিজের মা যখন এত অবুঝ, পেটের মেয়ের উপর এমন নিষ্ঠুর, সে আর কি করিবে? রওনা হইবার সময়ে গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমার ভার কি তুমি আর বইতে পারছ না ঠাকুর যে এমন করে ঠেলে ফেললে? আর যেন এখানে ফিরতে না হয় তাই ক'রো ঠাকুর।

মাতার এত ভর্ৎসনার একটি জবাব দেয় নাই মানদা। গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া সে নীরবে রওনা হইল মাতার সঙ্গে। রাজনগরে শ্বশুরের গৃহে তাহাকে রাখিয়া, তাহার শ্বশুরের কাছে চোখের জল ফেলিয়া, অজ্ঞান পুত্রবধূর অপরাধ ভুলিয়া তাহাকে পায়ে স্থান দিবার জন্য কান্নাকাটি করিয়া তিনি যখন বিদায় লইলেন মানদা নীরবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় দিল।

কিছুদিন হইতে লক্ষ্মীর শরীর খারাপ যাইতেছে। ইন্দ্র ভাবিল লক্ষ্মী সমস্ত সংসার দেখে, তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মৃন্ময়ী কয়েক মাস হইল কাশীতে গিয়াছিল, কবে ফিরিবে স্থির নাই। চিন্ময়ী কয়েক-দিনের জন্য আসিয়াছিল, অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর সই কামিনী বৌ মাঝে মাঝে আসেন বটে। তিনি এ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর অসুখ সম্বন্ধে কোন বলেন নাই। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেন না নহিলে ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত। লক্ষ্মীর নিজের ব্যবহারেও ইন্দ্র বড় কম বিস্মিত হয় না। অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে মৃদু হাসে। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে তাহার সম্মুখ হইতে পালাইবার চেষ্টা করে। ঔষধ খাইবার কথা বলিলে ঘাড় নাড়িয়া জানায় সে ঔষধ খাইবে না। শ্বশুর শাশুড়ীর ঔদাসীন্যেও ইন্দ্র কম বিস্মিত হইল না। শাশুড়ী প্রায়ই আসেন, মেয়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিজের চোখে দেখেন অথচ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত তাহাকে কোন কথা বলেন নাই।

অবশেষে লক্ষ্মীর অসুখ ধরা পড়িল ইন্দ্রের কাছে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে রজনী ডাক্তার আসিলে ইন্দ্র স্থির করিল ডাক্তারকে দিয়া সে লক্ষ্মীকে দেখাইবে। ইহার আগেই দেখান উচিত ছিল। লক্ষ্মীকে প্রস্তুত হইতে বলিবার জন্য সে অন্দরে ঢুকিয়া দোতলায় শয়ন কক্ষের দিকে চলিল। দেখিল ঘরের দরজায় পা ছড়াইয়া বসিয়া মুকীর মা কি বলিতেছে। ঘরের মেঝেতে শীতল পাটি বিছাইয়া বসিয়া লক্ষ্মী ও একজন ভদ্রমহিলা তাহার কথা শুনিতেছেন। ভদ্রমহিলাটির হাতে একখানা পাখা, লক্ষ্মীকে বাতাস করিতেছেন। কাহারও মাথায় কাপড় নাই।

ইন্দ্র এসময়ে অন্দরে আসেনা, তাই কাহারও কোন সঙ্কোচ নাই। আপনাদের মধ্যে গল্প গুজবে তিনজন এত মত্ত যে ইন্দ্রের পায়ের শব্দ কাহারও কানে যায় নাই। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া সকলে অপ্রস্তুত না হন এজন্য ইন্দ্র একটু আড়ালে সরিয়া মুকীর মাকে ডাকিল।

ডাক শুনিয়া মুকীর মা বলিল,—সই মা, বাবু ডাকতেছেন।

মুকীর মার কথায় ইন্দ্র বুঝিল ভদ্রমহিলাটি লক্ষ্মীর সই কামিনী বৌ। সে ভাবিল উনি আসিয়া ভালই হইয়াছে। ডাক্তার দেখাইবার সুবিধা হইবে।

সে অগ্রসর হইয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইল, বলিল—রজনী ডাক্তারবাবু এসেছেন। তাঁকে আমি আমি নিয়ে আসছি কি অসুখ হয়েছে দেখাবার জন্য।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, তাহার সই উঠিতে দিলেন·না। ঘোমটার মধ্য হইতে তিনি নিম্নস্বরে মুকীর মাকে, অর্থাৎ মুকীর মাকে আড়াল দিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—মুকীর মা, বাবুকে বল এখন বদ্যি ডাকতে হবে না, সময় হলে ধাই ডাকতে হবে। আর বদ্যি দেখাবার টাকা দিয়ে মেঠাই আনিয়ে দিন আমাদের, আমরা অসুখ ধরেছি, চিকিচ্ছে করছি।

খবর শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের মনে নূতন একটা ভাবের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে ভাবিল তাই লক্ষ্মীর এত লুকাচুরি, মেয়ের অসুখে শ্বশুর-শাশুড়ীর ঔদাসীন্য। মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া ইন্দ্র বলিল—মেঠাই আনতে লোক পাঠাচ্ছি, আপনি যাবেন না।

কামিনী বৌ লক্ষ্মীর গা টিপিলেন। হাসি চাপিয়া বলিলেন—মুকীর মা, বাবুকে বল কাল মেঠাই খাব, আজ রাত হয়েছে বাড়ী যাই।

লক্ষ্মীর সইয়ের কথায় ইন্দ্রের একটু লজ্জা হইল। সে বলিল—আচ্ছা।

তারপর তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

কামিনী বৌ বলিল—দেখলি সই, অসুখ ধরা পড়ায় কর্তা আহ্লাদে গলে গেলেন। এবার বাড়ী যাই ভাই। মুকীর মা, কাউকে ডাক, লণ্ঠন ধরে বাড়ী পৌঁছে দেবে আমাকে।

লক্ষ্মী ছাড়িল না। কামিনী বৌকে সন্ধ্যাবেলা এক পেট মিষ্টি খাইয়া ছেলেমেয়ের জন্য এক সরা মিষ্টি লইয়া যাইতে হইল।

ইতিমধ্যে রাজনগরে এমন এক ব্যাপার ঘটিল যাহার অনুরূপ ঘটনা পূর্বে আর ঘটিয়াছে বলিয়া কাহারও মনে পড়ে না।

মানদা আসিবার মাসখানেক পরে একদিন সকালের দিকে হঠাৎ রাজেনবাবু পাগলের মত জীবানন্দের কাছে আসিলেন। জীবানন্দকে তিনি যাহা বলিলেন গ্রামে আগেই তাহা প্রচার হইয়াছিল। কাল রাত্র হইতে মানদাকে পাওয়া যাইতেছে না। সেই সঙ্গে রাজেনবাবুর শয়ন ঘরে ট্রাঙ্কের মধ্যে নগদ

টাকাকড়ি, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূর যে সকল অলঙ্কার ছিল তাহাও পাওয়া যাইতেছে না।

ঘটনার বিবরণ শেষ করিয়া রাজেনবাবু বলিলেন,—বাপ মা মরা ভাইঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে আশ্রয় দিয়েছিলাম। ওর কথায় বিশ্বাস করে বৌমার কত লাঞ্ছনা করেছি। কাল সাপ পুষেছিলাম দুধ দিয়ে, জাত কাল সাপ। আমার সর্বস্ব চুরি করে কুলে কালি দিয়ে পালাল। ১৬

কাহার সঙ্গে জ্ঞানদা পালাইয়াছ তিনি বলিতে পারিলেন না। এ সম্বন্ধে গ্রামে নানা গুজব রটিল।

জ্ঞানদার গৃহ ত্যাগ রাজনগরের সমাজের উপর একটা বড় আঘাত বলিয়া গ্রামের লোকে গ্রহণ করিল। এতদিন পরে সকলের মনে পড়িল রাজেনবাবু রাজনগরের লোক নহেন, তিনি বিদেশী। লোকে তাঁহাকে বর্জন করিয়া চলিতে লাগিল।

লক্ষীর শরীর ক্রমে খারাপ হইয়া পড়িতেছিল।

রজনী ডাক্তারের ঔষধ, টোটকা-টাটকায় ফল দিল না, রক্তশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিল। ত্রিনয়নী ও জীবানন্দ উদ্বিগ্ন হইলেন।

চিন্ময়ীকে কয়েকদিনের জন্য রাজনগরে পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়া ইন্দ্র পত্র সহ নায়েবকে তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইল। শাশুড়ী সদয় হইয়া অনুমতি দেওয়াতে চতুর্থ দিনে চিন্ময়ী আসিয়া পৌঁছিল।

লক্ষীর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া সে বলিল—দাদা, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখান। রজনী ডাক্তার মশায়ের ভরসায় ওকে এখানে আর রাখবেন না।

রজনী ডাক্তার নিজেও কলিকাতা লইয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন।

ইন্দ্র জীবানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কলিকাতা যাওয়া স্থির করিল। প্রথমে তাহার রাধারাণী বৌ ঠাকরুণের কথা ভাবিয়া থাকিবার ব্যবস্থার জন্য দেবনাথকে চিঠি লিখিবে মনে করিয়াছিল। লক্ষীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিয়া মত পরিবর্তন করিয়া ব্রজনাথকে চিঠি লিখিল তাহার বাড়ীর কাছে একখানি ভাল বাড়ী দেখিয়া ভাড়া করিবার জন্য। চিন্ময়ীর শ্বশুরবাড়ীতে

চিঠি দিয়া নায়েবকে পাঠাইল তাহার শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলিয়া মন ভিজাইয়া চিন্ময়ীর কলিকাতা যাইবার প্রস্তাবে সম্মতি আদায় করিবার জন্য।

তিনদিন পরে ব্রজনাথ টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল বাড়ী ঠিক হইয়াছে। কবে ইন্দ্র রওনা হইবে জানিলে সে সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে। পরের দিন নায়েব ফিরিয়া আসিল চিন্ময়ীর শ্বশুরবাড়ীর একজন কর্মচারী ও ঝি সঙ্গে লইয়া। শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কড়া হুকুম বৌকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের ফিরিতে হইবে।

এই ব্যবহারে ইন্দ্র দুঃখিত হইল। চিন্ময়ী ভ্রাতাকে বুঝাইয়া বলিল,—বাবা বেঁচে থাকতে ওঁরা এই রকম ব্যবহার করেছেন। তাঁর অভাবে আমাকে যে এখানে কয়েকবার আসতে দিয়েছেন এই ত আমার ভাগ্য, দাদা। কলকাতা যাবার অনুমতি পাব এ আশা আমি একটুও করিনি।

যাইবার সময়ে লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চিন্ময়ী কাঁদিল। তারপর চোখের জল মুছিয়া ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করিতে গেল। লক্ষ্মী তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল—তুমি আমার বাপের সংসারের কর্ত্রী, আমার দাদার বৌ, প্রণাম করতে বাধা দিও না।

বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় লইয়া ঠাকুর দালানে প্রণাম করিয়া চিন্ময়ী পালকীতে উঠিল। যতক্ষণ পালকী দেখা গেল লক্ষ্মী নিষ্পলক চোখে সেদিকে চাহিয়া রহিল।

ভাল দিন দেখিয়া ইন্দ্র কলিকাতা রওনা হইল।

ত্রিনয়নী ছোট মেয়ে সরস্বতীকে লক্ষ্মীর সঙ্গে পাঠাইলেন। বলিলেন—প্রয়োজন বুঝিলে টেলিগ্রাম করিলে তিনি নিজে যাইবেন।

রওনা হইবার দিন মাতব্বর প্রজারা দেখা করিতে আসিল, বৃদ্ধ আজাহার সর্দার আসিল।

অন্দরে গিয়া সর্দার লক্ষ্মীকে বলিল—বৌমা, আল্লার দোয়ায় ভালোয় ভালোয় নিজের ঘরে ফির‍্যা আইসো। তুমি এহানে থাকবা না এডা মনে করতি এ বুড়োর ভালো লাগে না। আচ্ছা এহন যাই, তোমারে এক নজর ভাখবার জন্তি আইছিলাম বৌমা।

লক্ষ্মী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাথায় অল্প একটু ঘোমটা। সে মৃদু স্বরে বলিল—মেয়েকে আশীর্বাদ করো সর্দার জ্যেঠা।

সর্দার দুই হাত উর্ধ্বে তুলিল, তারপর নামাইয়া কপালে ঠেকাইল। ভারী গলায় বলিল—বৌমা আমি কেডা? আল্লার কাছে আরজ করি তোমার লাগ্যা।

বৃদ্ধের চোখে জল আসিয়াছিল, আর না দাঁড়াইয়া সে দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

ইন্দ্র যে গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হইল রাঘব সেই গাড়ী হইতে নামিল। উভয়ে পরস্পরকে দেখিল কিন্তু কথা বলিবার সময় হইল না। লক্ষ্মীদের গাড়ীতে উঠাইয়া বসাইয়া সব মাল উঠিল কি না সঙ্গের কর্মচারীর কাছে খবর লইতে লইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বাড়ী দেখিয়া ইন্দ্র ও লক্ষ্মীর খুব পছন্দ হইল।

ব্রজনাথের বাড়ীর ঠিক সম্মুখে রাস্তার অপর দিকে নূতন, দোতলা, মাঝারি আয়তনের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে এক ফালি খোলা জমি আছে, ভিতরেও খোলা জায়গা আছে।

ব্রজনাথ বলিল—ভাড়া একটু বেশী, কিন্তু নূতন বাড়ী, খোলামেলা ও কাছে বলে আমি ছাড়তে পারলাম না।

ইন্দ্র বলিল—বাড়ীটা আমাদের এত পছন্দ হয়েছে যে আর কিছু বেশী ভাড়া চাইলেও আমি আপত্তি করতাম না। বিশেষতঃ আপনার বাড়ার এত কাছে।

তারপর বলিল—আপনার মা কি একা তারাপুরে আছেন?

ব্রজনাথ—আমার এক দূর সম্পর্কের মাসীমা আছেন সেখানে। মানদাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার সময় আমি আপত্তি করেছিলাম। আমাকে গোপন করে তিনি মানদাকে রাজনগরে রেখে এসেছেন। তাঁর চিঠিতে এই খবর পেয়ে আমি একটু কড়া চিঠি লিখেছিলাম। আমার চিঠি পেয়ে বোধহয় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই নানা অজুহাত তুলে আসতে চাইছেন না।

ব্রজনাথের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইন্দ্র পাড়ার একজন নামকরা প্রবীণ ডাক্তারকে ডাকিল। কথা হইল তিনি কি বলেন শুনিয়া বড় ডাক্তার ডাকা হইবে।

ডাক্তারবাবু লক্ষ্মীকে পরীক্ষা করিয়া ইন্দ্রকে জানাইলেন পনের দিন তিনি কেস হাতে রাখিবেন। এই সময়ের মধ্যে উন্নতি না দেখা গেলে তিনি নিজেই বড় ডাক্তারকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইন্দ্র তাঁহার কথা ও ব্যবহারে আশ্বস্ত বোধ করিল।

কলিকাতা পৌঁছিবার দিনই লক্ষ্মী একজন নূতন সঙ্গী লাভ করিল।

বিকালের দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বসিয়া কথা বলিতেছে, মুকীর মা মদন চাকরকে লইয়া ঘরে বিছানা করিতেছে, পাঁচু ঠাকুরের ভাই সুমন্ত ঠাকুরের সঙ্গে একটি ছেলে উপরে উঠিয়া আসিল।

সুমন্ত বলিল—মা, ও বাড়ীর বাবুর ভাই আসিল দেখা করিতে।

লক্ষ্মী দেখিল অতি প্রিয় দর্শন বছর পনেরোর একটি ছেলে, বড় বড় ভাসা চোখ, একটু সঙ্কুচিতভাবে আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল, তারপর হেঁট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। সরস্বতীকে প্রণাম করিবার জন্য সে অগ্রসর হইল। লক্ষ্মী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

বলিল—তুমি ব'সো। ওকে আর প্রণাম করতে হবে না ভাই, ও তোমার সমান বয়েসী।

ছেলেটি সঙ্কুচিতভাবে লক্ষ্মীর কাছে বসিল।

লক্ষ্মী বলিল—তোমার নাম সোমনাথ, না?

ছেলেটি মাথা নোয়াইল।

লক্ষ্মী বলিল—তোমার লজ্জা করতে হবে না, সোমনাথ। তোমার মেজদা আদি ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার খুব ভাব, তিনি আমাদের কাছে থাকতেন কি না। তুমি আমাকে বৌদিদি বলে ডাকবে।

এই ভাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে সোমনাথের আলাপ হইল। সরস্বতীর সঙ্গে ভাব হইতে দেরি হইল না। লক্ষ্মী হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছে সরস্বতী সোমনাথের এক মাসের বড়। কাজেই তাহাকে সরস্বতী দিদি বলিয়া ডাকিতে হইল। চার পাঁচ দিনের মধ্যে সরস্বতী দিদি "সরী দি'তে" পরিণত হইল।

সোমনাথ বড় একা ছিল। লক্ষ্মীর কাছে আদর যত্নের আস্বাদ পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল। যখন ইচ্ছা সে উপরে উঠিয়া আসে, গল্প করে। সরস্বতীর

সঙ্গে বাঘবন্দী, গোলকধাম খেলে, স্কুলের কথা, পড়াশোনার কথা হয়। সরস্বতীর কাছে সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার দাদা দেবানন্দের কথা, ইন্দ্রের সেবকাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করে। সরস্বতীর উত্তর সন্তোষজনক মনে না হইলে লক্ষ্মীর কাছে জিজ্ঞাসা করে। সরস্বতীকে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটনের গল্প, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্যের গল্প শোনায়, পাড়ার লাইব্রেরী হইতে তাহাকে গল্পের বই আনিয়া দেয়।

একদিন একটা ইংরাজি কথার উচ্চারণ লইয়া সোমনাথের সঙ্গে সরস্বতীর তর্ক বাধিল।

তর্কের মুখে সোমনাথ বলিল—তুমি ইংরাজি bla ব্লে, ble ব্লি পর্যন্ত জানো, তবু আমার সঙ্গে তর্ক করছ? স্কুলে ভর্তি হও না কেন?

সরস্বতীর ইংরাজী বিদ্যা বাস্তবিক ফাষ্ট´ বুকের বেশী অগ্রসর হয় নাই। সমবয়সী সোমনাথের কথায় সে মনে আঘাত পাইল। সুযোগ বুঝিয়া সে ইন্দ্রের কাছে স্কুলে ভর্তি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—কত দিন এখানে থাকবে যে স্কুলে ভর্তি হতে চাও?

সরস্বতীকে মুখে একথা বলিলেও সে পাড়ার এক বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্তি করিয়া দিল; ভাবিল যে কয়দিন পারে পড়ুক।

৯

লক্ষ্মীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নূতন বাড়ীতে গুছাইয়া বসিবার পরে ইন্দ্র একটু অবসর পাইল।

সন্ধ্যাবেলা ব্রজনাথ আসিলে সে বলিল—বীরেন্দ্র বাবুর খবর কি? চলুন, তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করে আসি।

ব্রজনাথ—তিনি কলিকাতার বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্য, দু'তিন দিনের মধ্যে ফেরবার কথা। এখানে থাকলে নিজেই আসতেন। আপনি এখানে আসছেন তিনি জানেন।

ইন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল বাড়ীর ভিতরে যাইবার দরজার আড়ালে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সে উঠিয়া সে দিকে যাইতে দেখিল সোমনাথ তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতেছে।

সোমনাথকে ডাকিয়া সে বলিল—ওপরে গিয়ে তোমার সরীদি'কে একটু ডেকে দাও ত সোমনাথ।

সরস্বতী আসিতে তাহাকে কি বলিয়া ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ব্রজনাথ বলিল—ডাক্তারের চিকিৎসায় ফল কিছু বুঝতে পারছেন?

ইন্দ্র—মনে হয় কিছু উন্নতি হয়েছে। ভাবছি উনি যে সময় চেয়েছেন সে সময় পর্যন্ত দেখব কতদূর ফল হয়। মুস্কিল হয়েছে আমাদের দুই বাড়ীতে গৃহিণী গোছের কেউ না থাকাতে। আপনার বাড়ী ত নারী বর্জ্জিত।

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল—সোমনাথ তাই আপনার বাড়ীতে বেশী সময় কাটায়। মা না থাকতে ওর অসুবিধে হয়েছিল বেশী।

সরস্বতী একটু সঙ্কুচিত ভাবে ঘরে ঢুকিল একখানি রেকাবীতে কয়েকটি মিষ্টি লইয়া, পিছনে জলের গ্লাস হাতে মদন।

ইন্দ্র বলিল—এখানে আসন নেই, টিপয়ও নেই, ব্রজবাবুর হাতে দাও।

সরস্বতী রেকাবী হাতে আগাইতে ব্রজনাথ একটু বিব্রতভাবে উঠিয়া একটি মিষ্টি তুলিয়া লইল। বলিল—আমি খেয়ে এসেছি, এখন এত মিষ্টি খেতে পারব না। এগুলো নিয়ে যান।

সরস্বতী ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া মিষ্টির থালাটি তাহার হাতে দিতে গেল। ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—ব্রজবাবু খেলেন না, তার শাস্তি আমাকে কেন? ওটা মদনের হাতে দিয়ে তুমি যাও, পান ও মশলা পাঠিয়ে দাও।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া সরস্বতীর ঠোঁটের কোনে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। সে চলিয়া গেল।

ইন্দ্র বলিল—কয়েক দিন স্কুলে গিয়ে সরস্বতী একটু চটপটে হয়ে উঠেছে।

ব্রজনাথ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। বলিল—স্কুলের কথা কি বলছিলেন? ওঁকে কি স্কুলে দিয়েছেন?

ইন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল—বাংলা ও ভালই জানে, অল্প কিছু সংস্কৃতও জানে। ইংরাজি শেখবার ইচ্ছে, তাই স্কুলে যাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ কথার পরে ব্রজনাথ উঠিল।

ইন্দ্র বলিল—পরশু বোধহয় কলেজ বন্ধ আছে। আপনাকে দুপুরে এখানে খেতে বলেছি মনে আছে ত? সোমনাথ ত ঘরের ছেলে।

লক্ষ্মীর শরীর ধীরে ধীরে ভাল হইতেছিল। দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ নাই ডাক্তার বলিয়াছেন। ইন্দ্র ভাবিল চার পাঁচ দিনের জন্য সে রাজনগরে ঘুরিয়া আসিবে। এখানে যে বন্দোবস্ত আছে দুই চারিদিনের জন্য সে না থাকিলে অসুবিধা হইবে না। যাইবার সব ব্যবস্থা হইল। রওনা হইবার দিন সকালে জীবানন্দের এক পত্র আসিল। এই পত্র সব ব্যবস্থা ওলটপালট করিয়া দিল।

অন্য কথার পরে জীবানন্দ লিখিয়াছেন—একটা দুঃসংবাদ জানাইতেছি। দিন সাতেক আগে রাজেন বাবুর পুত্রবধূ মারা গিয়াছেন। একটা গুজব রটিয়াছে রাঘব কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীকে এমন প্রহার করে যে তাহার ফলে তিনি মারা যান। রাজেন বাবুর প্রতিবেশী চরণদাস বৈরাগী না কি সন্ধ্যার পরে রাজেন বাবুর বাড়ী হইতে কয়েকবার চিৎকার শুনিয়াছিল। লোকে বলিতেছে এই হত্যার ব্যাপার গোপন করিবার জন্য রাঘব অনেক রাত্রে তাঁহার দেহে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। তারপর উঠানে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া লোক ডাকিতে থাকে। যাঁহারা ঘরের দরজা বন্ধ মনে করিয়া উহা ভাঙ্গিতে অগ্রসর হন তাঁহারা দেখিলেন দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করা হয় নাই, উহা খোলা ছিল। পাল্লা ঠেলিতে দরজা খুলিয়া গেলে তাঁহারা দেখেলিন মানদার দেহ ইতিমধ্যে এমন বিকৃত হইয়াছিল যে আর কোন চেষ্টা করা বৃথা।

ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাদের মনে সন্দেহের উদয় হইল।

ইতিমধ্যে আগুন ঘরের জিনিস পত্রে ছড়াইয়া পড়িল ও ক্রমে টিনের চালায় আগুন লাগিল। রাজেন বাবু ও রাঘবের চিৎকার সত্ত্বেও কেহ আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিলেন না। রাঘবের টিনের শয়নঘর ভস্মীভূত হইল। বাড়ীর অন্যান্য ঘরগুলি ফাঁকে হওয়াতে আগুন আর ছড়াইতে পারিল না।

রাজনগরে এমন শোচনীয় ব্যাপার ইতিপুর্বে আর ঘটে নাই। গ্রামের সমস্ত লোক বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অবস্থা বুঝিতে পারিয়া রাঘব দুই দিন পরে কর্মস্থানে চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার পরের রাত্রে রাজেন বাবুর বাড়ীর বাকী ঘরগুলি একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। গ্রামের একটি লোকও সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। কে আগুন লাগাইল কেহ জানে না।

সর্বসান্ত হইয়া রাজেনবাবু রাজনগর হইতে ছেলের কাছে চলিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপার তুমি লক্ষ্মীর নিকট গোপন রাখিবে।

পত্র পড়িয়া দুঃখিনী মানদার জীবনের এই মর্মান্তিক অবসানে ইন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হইল। মানদার মাতা শরৎসুন্দরীর কথা মনে পড়িল। ভদ্র মহিলা নিজের জীবনে এত দুঃখ পাইয়াও জোর করিয়া মানদাকে এই নিয়তির মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। নিজের একটা পুরাতন অন্ধ সংস্কারের নিকট মেয়েকে বলি দিয়াছেন। তাহার মন শরৎসুন্দরীর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল, আবার ব্রজনাথ, আদিনাথ ও সোমনাথ, মানদার এই তিন ভ্রাতার প্রতি সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে স্থির করিল ব্রজনাথের নিকট সে সকল কথা বলিবে না, মানদার আত্মহত্যার কথাই জানাইবে।

চিঠিখানা বাক্সে বন্ধ করিয়া সে ব্রজনাথের বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল।

ব্রজনাথ পড়িবার ঘরে কি কাজে নিযুক্ত ছিল, ইন্দ্রকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল।

ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—ব্যাপার কি ইন্দ্র বাবু? আপনার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? অপনার স্ত্রী ত ভাল আছেন জানি। দেশ থেকে কোন খবর এসেছে?

ইন্দ্র চট করিয়া উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ পরে বলিল—ব্রজবাবু, আপনার একবার তারাপুরে যাওয়া ভাল।

ব্রজনাথ কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

ইন্দ্র বলিল—আমি খবর পেলাম আপনার ভগ্নী হঠাৎ মারা গেছেন। আপনার মা সংবাদ পেয়ে থাকলে ব্যাকুল—

ব্রজনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল—মানদা মারা গেছে? আপনি চিঠিতে খবর পেয়েছেন? কে লিখেছে চিঠি? তার শ্বশুর বা স্বামী কেউ ত আমাকে কিছু জানায়নি।

ইন্দ্র তাহাকে বসাইয়া মানদার আত্মহত্যার কথা, রাজেন বাবুর বাড়ী পুড়িয়া যাইবার কথা, ও তাঁহার গ্রাম ত্যাগ করিবার কথা সংক্ষেপে জানাইল।

ইন্দ্রের মুখে ঘটনা শুনিয়া ব্রজনাথ বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কয়েক ফোঁটা চোখের জল তাহার গাল বাহিয়া পড়িল। ইন্দ্র নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে ব্রজনাথ কিছু শান্ত হইবার পরে স্থির হইল সে তাহার মাতাকে আনিতে তারাপুরে যাইবে।

সে বলিল—আপনারা আছেন, সোমনাথ এখানে থাক। তাকে এখন কোন কথা বলবেন না।

ব্রজনাথ তারাপুরে চলিয়া গেল। ইন্দ্রের বাড়ীতে সোমনাথের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা হইল।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল, ব্রজনাথ তখনও তারাপুর হইতে ফিরে নাই। ইন্দ্র তাহার এক চিঠি পাইল।

সে লিখিয়াছে—মানদার খবর মা কিছু জানিতেন না। হঠাৎ আমাকে তারাপুরে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন মানদা বোধ হয় আমাকে লিখিয়াছে, আমি রাজনগর হইতে তাহাকে আনিবার জন্য আসিয়াছি, মৌখিক একটা অনুমতি তাঁহার কাছে আদায় করিবার জন্য তারাপুরে আসিয়াছি। এই সন্দেহ করিয়া প্রথম দিন তিনি আমাকে এড়াইয়া চলিলেন, আমিও কিছু বলিলাম না। দ্বিতীয় দিন তিনি নিজেই মানদার কথা তুলিলেন। সে শ্বশুর বাড়ীতে ভাল আছে, সংসারে তাহার মন বসিতেছে, তাহার শ্বশুর খুব ভাল লোক, এ সময়ে তাহাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে আনা সঙ্গত নয় ইত্যাদি নানা কথা বলিলেন।

তিনি থামিলে আমি বলিলাম—মা, মানদার জন্য তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না, সংসার থেকে সে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে।

তারপর ক্রমে ক্রমে সব কথা জানাইলাম। বলিলাম—জোর ক'রে

মানদাকে শ্বশুর বাড়ী নিয়ে গিয়ে তুমি তাকে শেষ করলে মা। সে ত বেশ ছিল এখানে।

আমার কথা শুনিয়া মা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জানিলাম তিনি ঠাকুর ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়াছেন। তৃতীয় দিনে দরজা ভাঙ্গিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম মড়ার মত তিনি মেঝেতে পড়িয়া আছেন। মাথার চুল রক্তে জটা বাঁধিয়াছে, কপালে, মুখে রক্তের দাগ। দেখিয়া মনে হইল বাঁধানো মেঝেতে তিনি মাথা খুঁড়িয়াছেন।

সেই হইতে তিনি কথা বন্ধ করিয়াছেন।

আর দিন কয়েক পরে একটু সুস্থ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে পারিব আশা করি।

ব্রজনাথের চিঠি পড়িয়া ইন্দ্র ভাবিল লক্ষ্মীকে মোটামুটি অবস্থা জানাইয়া রাখা ভাল ব্রজনাথের মা আসিলে কোন কথা গোপন রাখা যাইবে-না।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ইন্দ্র সোমনাথ ও সরস্বতীর গলা শুনিল। বুঝিল দুইজনে তর্কযুদ্ধ চলিতেছে। আজকাল উভয়ের মধ্যে প্রায়ই এরকম তর্কযুদ্ধ, বিচ্ছেদ ও পুনরায় সন্ধি হয়। দুইপক্ষের বিবাদে মাঝে মাঝে লক্ষ্মীকে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। মধ্যস্থের রায় তাহার বিপক্ষে গেলে সরস্বতী উচ্চতর আদালত হিসাবে ইন্দ্রের কাছে আপীল করে কখনও কখনও। সোমনাথ মধ্যস্থের রায় চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লয় বরাবর।

উপরে উঠিয়া ইন্দ্র শুনিল তর্কের বিষয় আন্দামানের অবস্থান। সোমনাথ ল্যাটিচুড, লঙ্গিচুড ও মাইলের হিসাব দিয়া বুঝাইতেছে যে কালাপানি পার হইতে হয় বলিলেই বুঝায় না যে আন্দামান যাইতে একমাস লাগে; মাত্র তিন দিনে সেখানে পৌঁছানো যায়। সরস্বতীর যুক্তি এই যে যখন কালাপানি পার হইতে হয় আন্দামান এত কাছে হইতে পারে না।

ইন্দ্র শুনিল কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে আন্দামানের কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী অনশন ধর্মঘট করিয়াছে। সরস্বতী বলিল তাহার দাদা আন্দামানে আছেন। সে জায়গা অনেক দূর ও দুর্গম। সোমনাথ প্রতিবাদ করিয়া বলিল আন্দামান ভারতবর্ষ হইতে বেশী দূরে নহে।

মধ্যস্থতা করিতে বসিয়া ইন্দ্র তর্কের বিষয় ভুলিয়া গেল। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল অনশনকারী বন্দীদের ছায়া ছবি। অনশনে দুর্বল, অবাধ্য বন্দীকে জোর করিয়া উলঙ্গ করিয়া ফেলা হইল। তারপর তাহাকে চটের থলিয়া পরানো হইল। হাতে হাতকড়া ও পায়ে ডাণ্ডাবেরী লাগাইয়া তাহার নাকের মধ্যে রবারের নল ঢুকাইয়া দেওয়া হইল জোর করিয়া খাওয়াই-বার জন্য।

ইন্দ্রকে বিমনা দেখিয়া তর্কযুদ্ধের পক্ষদ্বয় নীরবে উঠিয়া স্থানত্যাগ করিল।

হঠাৎ ইন্দ্র যেন তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। লক্ষ্মী তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিতেছে—কি ভাবছ এত?

ইন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ঘরে চল, কথা আছে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বীরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল ইন্দ্রের গৃহে। ইন্দ্র তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—আপনি এখানে নেই জানতাম। কবে ফিরলেন?

বীরেন্দ্র বলিল—দু'দিন আগে ফিরেছি। ব্রজবাবুর বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম তিনি হঠাৎ দেশে গেছেন। তাঁর ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় চাকর আপনার নাম করে বলল ও বাড়ীতে আছে। আপনি যে এই বাড়ীতে রয়েছেন জানতাম না।

আলাপ জমিয়া উঠিল। অন্যান্য কথার পরে বীরেন্দ্র বলিল,—আমাদের একটা ক্লাব আছে। ক্লাবের নাম ইণ্ডিয়ান সোশিয়ালিষ্টস ক্লাব। ব্রজবাবু ক্লাবের সভ্য। আরও কয়েকজন সভ্য আছেন, অধ্যাপক, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার। ক্লাবের উদ্দেশ্য এদেশে সোশিয়ালিজম প্রচার করা। ক্লাবে য়ুরোপ থেকে সোশিয়ালিষ্ট সাহিত্য আমদানী করা হয়। বিলাতের লেবর পার্টির সঙ্গে আমাদের সংযোগ আছে, পার্টি অনেক সোশিয়ালিষ্ট প্যামফ্লেট পাঠিয়েছে ক্লাবে। আপনাকে একদিন আসতে হবে। এপর্যন্ত জমিদার সভ্য পাওয়া যায় নি, আপনাকে দলে আনতে হবে।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—আগে সোশিয়ালিজম জিনিসটা ভাল করে বুঝান আমাকে। জানেন ত আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, লেখাপড়া বিশেষ হয়নি।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ইন্দ্রের অনুরোধে জলযোগ করিয়া বীরেন্দ্র উঠিল। ইন্দ্র বলিল—একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। কথাটা ব্রজবাবুর পরিবার সম্পর্কিত।

সে মানদার আত্মহত্যার কাহিনী বীরেন্দ্রকে জানাইল। বলিল—মানদার মৃত্যুর ইতিহাস আমাদের সমাজব্যবস্থা ও সংস্কারের একটি ট্রাজেডি। ব্রজবাবু কতখানি আঘাত পেয়েছেন এর ফলে বুঝতে পারছেন।

বীরেন্দ্র সমস্ত কথা শুনিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিল। বলিল—আপনি জানিয়ে ভাল করলেন।

নমস্কার করিয়া সে বিদায় লইল।

ব্রজনাথ তাহার মাতাকে লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। দুই তিন দিন পরে তাঁহার হাতে সব ভার দিয়া পূজা উপলক্ষ্যে ইন্দ্র রাজনগরে রওনা হইবার ব্যবস্থা করিল।

পূজার সময়ে শ্বশুরের ঘর ছাড়িয়া স্বামীকে ছাড়িয়া সে কলিকাতায় পড়িয়া থাকিবেনা বলিয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে অনেক অনুরোধ করিল তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য।

ইন্দ্র বলিল—তোমার এ অবস্থায় আমি নিয়ে যেতে সাহস পাইনে। অনেক কষ্টে তোমার স্বাস্থ্য কিছু ফিরেছে। এখন পুজোর গোলমালের মধ্যে তোমাকে নিয়ে গেলে এই সুফলটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে আমার সব বজায় থাকবে। আর অনুরোধ করো না আমাকে।

লক্ষ্মী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি না বুঝে তোমার অবাধ্যতা করেছি। আমার ভয় বেড়েছে। তোমাকে চোখের আড়াল করতে ভয় হয় তাই—

ইন্দ্র চুপ করিয়া তাহার মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলাইল। তারপর বলিল——পাঁচদিনের বেশী একটি দিনও হবে না। এই ক'টাদিন সাহস করে থাকতে পারবে না?

লক্ষ্মী স্বামীর হাত মাথা হইতে নামাইয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, বলিল—পারবো। তুমি যাও।

পূজা শেষ করিয়া পাঁচদিন পরে ইন্দ্র রাজনগর হইতে ফিরিল। লক্ষীর স্বাস্থ্য আরও কিছু ভাল হইয়াছে দেখিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিল।

লক্ষী বলিল—তুমি চলে গেলে আদি ঠাকুরপোর মা এ বাড়ী এসে বসলেন। নির্বাক পাথরের মানুষটি তারাপুর থেকে এসেছিলেন, দু'একদিনের মধ্যে তাঁর আশ্চর্য পরিবর্তন হল। সরী আমাকে ঔষধ পথ্য দেওয়া যে সব কাজ করত তিনি নিজের হাতে সে সব কাজ তুলে নিলেন। সরীকে বললেন—তুমি ছেলেমানুষ, এসব ঝক্কির কাজ পারবে কেন? স্কুলের পড়া করো, গল্প গুজব করো, যাও। সেই থেকে তিনি আমাকে আগলে আছেন। এমন নিয়ম বাঁধা কাজ তাঁর যে দেখে আমি অবাক হয়েছি।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—যাক, এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

কয়েকদিন পরে ইন্দ্র ব্রজনাথের গৃহে তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল সিঁড়ি হইতে কে ডাকিল—ব্রজবাবু আছেন মশাই?

ব্রজনাথ বলিল—আসুন।

ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া সে বলিল—আমাদের ফেবিয়ান ফ্রেণ্ড বীরেন্দ্রবাবু আসছেন।

ইন্দ্র বলিল—আপনি দেশে থাকবার সময় উনি বার দুই এসেছিলেন। সরস্বতীর সঙ্গে বলিল ওঁর আলাপ হয়েছে। সোমনাথ আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

বীরেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া বলিল—নমস্কার ইন্দ্রবাবু। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন? আর সেই যাঁকে দেখলাম, মানে আমার বন্ধু ব্রজবাবু যাঁকে পণ্ডিতা রমাবাই কিংবা সরোজিনী নাইডু বানাবার ভার নিয়েছেন তিনি কেমন আছেন?

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—উভয়েই ভাল আছেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহিলাটি যে রমাবাই বা সরোজিনী নাইডু হতে চান এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?

বীরেন্দ্র বলিল—অনেষ্টলি স্পিকিং ওটা খবর নয়। অনুমান। ব্রজনাথের মত একজন তীক্ষ্ণ পণ্ডিত যখন কাজে নেমেছেন—

ব্রজনাথ বাধা দিয়া বলিল—আই প্রোটেষ্ট। তীক্ষ্ণ পণ্ডিত মানে কি?

বীরেন্দ্র বলিল—বন্ধু, a joke is spoiled by explanation. সুতরাং

বুঝে নাও যে জানো সন্ধান। যাক্, একটা মজার কথা বলি শুনুন, কথাটা এখনও গজগজ করছে মাথায়। বিলাতে ষ্ট্রাইক হচ্ছে, ফ্রান্সে হচ্ছে ব্রেড-রায়ট। এ খবরের ওপর মন্তব্য করে আমাদের লার্ণেড কাগজের এডিটর কি বলছেন জানেন ?

"যে দেশে খাদ্যবস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হইলে স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা করে সে দেশের লোকেরা ভারতবর্ষের সভ্যতার দোষত্রুটি বাহির করিতে আসে ইহা বিস্ময়ের কথা। ভারতবর্ষের লোক খাদ্যাভাবে মরিতে বসিলেও অপরকে আক্রমণ করে না। ইহা দুঃখের বিষয় যে এক শ্রেণীর ইংরাজ এহেন জাতিকে দুরন্ত ও সিডিশাস বলিয়া সমালোচনা করেন।"

—না খেতে পেয়ে মরতে বসলেও কারো গায়ে হাত তোলে না জাতের এই ক্লৈব্য নিয়ে কত গর্ব দেখেছেন ?

বীরেন্দ্রের কথা শুনিয়া মিনিট খানেক চুপ করিয়া কি ভাবিল ব্রজনাথ। বলিল—জাতির ক্লীবতাকে উপহাস বা কষাঘাত না করে তা নিয়ে গর্ব করা থেকে বোঝা যায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে একদল লোক বরাবর রয়েছেন যাঁরা সব রকম প্রোগ্রেসিভ চিন্তার ছোঁয়াচ থেকে দেশের লোককে সরিয়ে রাখতে চান ভারতবর্ষের প্রাচীন কালচার, প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা, প্রাচীন ট্র্যাডিশানের দোহাই দিয়ে। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ট্র্যাডিশান, প্রাচীন কালচার যে কি বস্তু তাঁরা কেউ তা জানেন না। প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা যে প্রাচীন সমাজের জন্য রচিত হয়েছিল তা মানতে রাজি নন' তাঁরা। সাতশ বছর পরাধীন থেকে, শুধু আত্মরক্ষামূলক চিন্তাধারার অনুসরণ করবার ফলে স্বাধীন চিন্তার ধারা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক চিন্তার ধারা যে সব বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল আজ সেই সকল বকেয়া, বাতিল, পচা জিনিস গুলোকে এঁরা ভারতবর্ষের আদি, অকৃত্রিম, সনাতন জিনিস ব'লে চালাবার চেষ্টা করেন।

ব্রজনাথ থামিলে বীরেন্দ্র হাত তালি দিয়া বলিল—সন্দেহ হচ্ছে, ব্রজবাবু সোশিয়ালিষ্ট ক্লাবের জন্য তৈরী করা বক্তৃতাটা অকালে ছেড়ে দিলেন। ইন্দ্রবাবু, আপনি জমিদার লোক, একটু সমালোচনা করুন ব্রজবাবুর বক্তৃতার।

ইন্দ্র কিছু বলিবার আগে সোমনাথ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল। ইন্দ্রের কাছে গিয়া তাহার কানে কানে বলিল—বৌদিদির শরীর খারাপ লাগছে। মা আপনাকে ডাকছেন।

ইন্দ্র বলিল—আমার ডাক পড়েছে, উঠলাম।

ইন্দ্র চলিয়া গেলে বীরেন্দ্র বলিল—এত জরুরী তলব কেন?

ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবুর স্ত্রীর প্রসবের সময় হয়েছে, মা বলছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ আবার ঘরে ঢুকিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ব্রজনাথ বলিল—কি রে ও বাড়ীর খবর কি?

সোমনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আপনি আসুন বড়দা, বৌদিদি কেমন করছেন।

ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবু কোথায়?

সোমনাথ—তিনি ডাক্তার বাবুর বাঁড়ী গেছেন। মা বললেন, তোর বড়দাকে ডেকে আন।

ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্র উঠিল। বীরেন্দ্র বলিল,—আপমি যান। আমি কাল এসে খবর নেবো।

১০

দিন তিনেক পরে।

ইন্দ্র নীচের ঘরে পায়চারি করিতেছে, এক একবার উপরে যাইবার সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ উঠিতেছে, আবার নামিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। উপরে লক্ষীর ঘরে ডাক্তার, ধাত্রী, শরৎসুন্দরী ও রাধারাণী রহিয়াছে। ঘরের বাহিরে দরজার কাছে সরস্বতী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পাশের ঘরে রাধারাণীর মেয়ে নান্টিকে সোমনাথ মহাউৎসাহে গল্প শুনাইতেছিল। গল্প শুনিতে শুনিতে নান্টি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সোমনাথ এক একবার উঠিয়া লক্ষীর ঘরের সম্মুখে ঘুরিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নান্টির পাশে বসিতেছে।

রাঁধারাণী আগের দিন বিকালে মেয়েকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল লক্ষীকে দেখিতে। তাহার অবস্থা দেখিয়া সে আর বাড়ী ফিরে নাই, এখানে রহিয়া গিয়াছে। তাহার রহিয়া যাইবার আর একটি কারণ ইন্দ্রের ব্যাকুলতা।

স্ত্রী প্রসববেদনায় কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া স্বামীর এই ব্যাকুলতা তাহার দেখে নূতন জিনিষ বলিয়া মনে হইল। তাহার বয়সে কোন সংসারে ইহা দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। স্ত্রীর কষ্টে স্বামীর বিচলিত হওয়া সনাতন রীতির যেন একটা বিসদৃশ ব্যতিক্রম। সমাজের পুরুষরা কি মেয়েদের মানুষ বলিয়া ভাবে যে তাহাদের কষ্টের কথা চিন্তা করিবে? যখন খেয়াল হইল কাছে টানিল, যখন খেয়াল হইল দূরে ঠেলিয়া দিল, মেয়েরা সবাই পুরুষের কাছে খেয়ালের পুতুল।

ইন্দ্রের মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রাধারাণীর মনে প্রথমে একটু বিস্ময়ের ধাক্কা লাগিয়াছিল। বিস্ময়ের সঙ্গে এক কোঁটা আত্মপ্রসাদের ভাবও ছিল বোধহয়। ইন্দ্র যে সাধারণ পুরুষ মানুষের ব্যতিক্রম, ইন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে তাহার এই যে ধারণা হইয়াছিল তাহা বাস্তবিক সত্য। নিজের মনে একটু হাসিয়া সে ভাবিল উদাসীন পুরুষের ঔদাসীন্য ঘুচাইবার লোক আসিতেছে এইবার।

সন্ধ্যার পরেও রাধারাণীর ফিরিবার তাগাদা না দেখিয়া ইন্দ্র যে কথা তুলিলে রাধারাণী বলিল,—আমি ত আজ বাড়ী ফিরতে পারবো না ঠাকুর পো। আপনি কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিন।

ইন্দ্র কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার রাধারাণীর দিকে চাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। এই সামান্য কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিটুকু পাইয়া রাধারাণী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। ইন্দ্র অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। নানা রকমের এলোমেলো চিন্তা তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল। সে ভাবিতেছিল প্রতি মুহূর্তে এই পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষ জন্মিতেছে আবার মরিতেছে। অসীম শূন্যের যাত্রীর দল এক দরজা দিয়া ঢুকিয়া অন্য দরজা বাহির হইয়া যাইতেছে। আসিবার ও যাইবার দুইটি প্রক্রিয়াই কত কষ্টকর। কাহার খেয়ালে মাঝখানের দিন কয়েকের খেলাটুকু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে? সে

খেলার সত্যিকার কতখানি মূল্য আছে যে মানুষকে দুই দুইবার এইভাবে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে ?

সে ভাবিতেছে আর পায়চারি করিতেছে, ব্রজনাথ কখন আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে সে লক্ষ্য করে নাই।

ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবু, চলুন উপরে যাই।

ইন্দ্র বলিল—আপনি কখন এলেন ?

উভয়ে উপরে উঠিতে যাইবে সরস্বতী ব্যগ্রভাবে নীচে নামিতেছে দেখা গেল। ইন্দ্রকে দেখিয়া সে বলিতেছিল—দিদির একটা ফুটফুটে মেয়ে,—ইন্দ্রের পিছনে ব্রজনাথের উপর চোখ পড়িতে সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

সকলে উপরে গেল।

ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিলেন। ইন্দ্রকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—এবার আমাকে ছুটি দিন। আর কোন ভয়ের কারণ নেই। এক কোঁটা একটা মেয়ে, আসবার আগে কি ভয় খাইয়ে দিয়েছিল সবাইকে।

সোমনাথের হাত ধরিয়া নান্টি সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে নান্টির একঘুম হইয়া গিয়াছে।

নান্টি ডাক্তারকে বলিল—এক কোঁটা মেয়ে কে ? আমাকে বলছ ? আমি ত বড় মেয়ে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—এক কোঁটা মেয়ে ঐ ঘরে রয়েছে। তুমি ত বড় মেয়ে। ইন্দ্রের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—রাত্রে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না। সকালে আমি নিজেই আসব ইন্দ্রবাবু, লোক পাঠাতে হবে না।

ডাক্তার নীচে নামিয়া গেলেন।

রাধারাণী কয়েকদিন রহিয়া গেল ইন্দ্রের গৃহে। নান্টিকে সে পরের দিন পাঠাইয়া দিয়াছিল স্কুল কামাই করিলে তাহার বাবা বকিবেন বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া। সাহেবী স্কুল, কামাই করিলে রীতিমত কৈফিয়ৎ দিতে হয় অভিভাবককে।

নান্টির যাইবার ইচ্ছা ছিল না। বাড়ীতে নিয়মবাঁধা জীবন, এখানে অবাধ স্বাধীনতা। বাড়ীতে আয়া কেবল বকে; আর এখানে সোমনাথ দাদা কেমন

ভাল ভাল গল্প বলেন। বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা হইবে কেন তাহার? কিন্তু তাহার কয়েক বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় নান্টি বুঝিয়াছে শুধু বড়রা জোর করিতে পারে। নান্টি ছোট্ট, কোন বিষয়েই তাহার জোর করিবার উপায় নাই। কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে যাইতে হইল।

রাধারাণী এখানে থাকিবার একটা যুক্তি মনে মনে তৈয়ারী করিয়াছিল। সরস্বতীকে বাদ দিলে এখানে সে লক্ষ্মীর নিকটতম আত্মীয়, শরৎসুন্দরী বাহিরের লোক। আত্মীয় হিসাবে প্রয়োজনের সময়ে তাহার এখানে থাকা কর্তব্য। ইন্দ্রের গৃহে কয়েকটা দিন থাকিবার এই অজুহাত সে ব্যবহার করিল বটে কিন্তু নিজের চোখে সে দেখিতেছিল বাহিরের লোক শরৎসুন্দরী আপন কর্তব্যের, অর্থাৎ প্রসূতির পরিচর্যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখেন নাই আর কাহারও জন্য। আর রাধারাণী একাজের জানেই বা কতটুকু?

আসল কথা এই যে পরিচিত সমাজের ও সংসারের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া রাধারাণীর দেহে যেন মুক্ত প্রান্তরের হাওয়ার স্পর্শ লাগিল। ইন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দেয় রাধারাণী, ঠাকুরপো পূজা করিবার মত দেবতা সে নিজের মনে বলে, এখানকার অন্য প্রত্যেকটি লোকের ব্যবহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সুরে ভরা।

শরৎসুন্দরীকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যায় রাধারাণী। আশ্চর্য হইবার কথা। আগের শরৎসুন্দরী মানদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গিয়াছেন। এ শরৎসুন্দরী নূতন মানুষ, যেমন শান্ত তেমনি কোমল। কোন অভিযোগ নাই, বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই, গভীর শোক, মর্মভেদী অনুশোচনা তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন মানুষ তৈয়ারী করিয়াছে। নিজের যে প্রখর স্বাধীন সত্তা ছিল গোবিন্দজীর চরণে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়া শুধু তাঁহার ইচ্ছার যন্ত্ররূপে যেন বাঁচিয়া আছেন।

রাধারাণীর বাল্য জীবন দুঃখের। শৈশবে ও কৈশরে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সংসারের নগ্ন, কদর্য মূর্তি অহরহ তাহার চোখে পড়িয়াছে। তাহার মাতা অনেকদিন মারা গিয়েছিলেন, একমাত্র আশ্রয় ছিল তাহার একান্ত নির্বিরোধী বৃদ্ধ পিতা ও তাঁহার গোপাল। বিদ্যুৎ শিখার মত রূপসী কন্যাকে দুষ্টলোকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে আড়ালে

রাখিবার কোন উপায় না দেখিয়া পিতা তাহাকে গোপালের পূজার মন্ত্র দিয়াছিলেন। এই পূজার মন্ত্র হইয়াছিল তাহার রক্ষা কবচ।

বিবাহ হইবার পরে এই রক্ষা কবচ রাধারাণীর অনাবশ্যক মনে হইল, এবং বিত্তশালী গৃহে ভোগ বিলাসের মধ্যে পড়িয়া তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইল। স্বামী বিলাত হইতে ফিরিবার পরে সে পঞ্চক্রোশী ছাড়িয়া কলিকাতায় বাস করিতে আসিল। স্বামীকে তুষ্ট করিবার জন্য সে নূতন সমাজের হালচাল সাগ্রহে আয়ত্ত করিল। কিছুদিন বেশ চলিল।

তারপর স্বামীর উশৃঙ্খল স্বভাবের পরিচয় ক্রমে প্রকট হইতে লাগিল। রাধারাণীর রূপের অভিমানে আঘাত লাগিল। সে ভাবিল পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি নিরন্তর তাহাকে অনুসরণ করে, আর এই লোকটি তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া এত অনাদর, অবহেলা দেখাইতে ভরসা করে। এই সময়ে নান্টি তাহার কোলে আসিল। তাহার বিক্ষুব্ধ মন কতকটা শান্ত হইল কিন্তু উশৃঙ্খল স্বামীর প্রতি তাহার মনের বিরূপতা না কমিয়া বাড়িয়া চলিল।

নিজের মনের এই অশান্তির মধ্যে শরৎসুন্দরীকে দেখিয়া সে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইল। ভাবিল ইঁহার সান্নিধ্যে তাহার মনের সঞ্চিত গ্লানি খানিকটা কাটিয়া যাইতে পারে।

লক্ষ্মী কিছু সুস্থ হইলে দিন সাতেক পরে রাধারাণী স্বগৃহে ফিরিয়া গেল।

লক্ষ্মীর শরীর মাসখানেকের মধ্যে অনেকটা সারিয়া উঠিল। শরৎসুন্দরী এখন লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া তাহার মেয়েকে লইয়া থাকেন। বাচ্চার দেহ নাড়াচাড়া করিবার মত একটু শক্ত হইতে সরস্বতীকে তাঁহার অংশীদার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন তিনি।

সরস্বতীকে মায়ের সঙ্গে ভাগীদার হইতে দেখিয়া সোমনাথ তাহার দাবি জানাইল। সরী দি যদি বাচ্চাকে কোলে করিতে পারে, খেলা দিতে পারে, সে কেন পারিবে না? সরী দি ত তাহার চাইতে মোটে এক মাসের বড়। নেহাৎ বৌদিদি বলিয়াছেন তাই সে সরী দি বলে, নহিলে বলিত—এই সরী!

বাচ্চাকে কোলে লইবার জন্য দুইজনের মধ্যে এই কলহ শুনিয়া লক্ষ্মী হাসে, শরৎসুন্দরীও হাসেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথকে শাসনও করেন। বলেন—

তুই বেটা ছেলে, এইটুকু বাচ্চাকে কি তুই নিতে পারিস? ওর ব্যথা লাগবে। আর একটু বড় হোক তখন নিস।

সোমনাথ রুষ্ট হইয়া বলে—আর একটু বড় হলে বাচ্চা কি এখানে থাকবে? ও ত সেই রাজনগরে চলে যাবে। এই সরী দি, শিগগির দে আমার কোলে, নইলে আর তোকে আঁক শেখাবো না বলে দিচ্ছি। বড়দার কাছে ল. সা. গু., গ. সা গু. শিখতে যাস, দেখিস হেসে তোকে উড়িয়ে দেবে। বলবে—ধেৎ, এত বড় মেয়ে ল. সা. গু. জানে না!

শরৎসুন্দরী ও লক্ষ্মীর উপস্থিতিতে সোমনাথের বড়দাদা কর্তৃক এইরূপ অভ্যর্থনার ইঙ্গিতে সরস্বতীর মুখ লাল হইল। শরৎসুন্দরীর কাছে প্রতিবাদ করিয়া সে বলিল,—দেখুন তো মাসিমা, সোমনাথ যা তা বলছে।

শরৎসুন্দরী কিছু বলিবার আগে সোমনাথ বলিল—যা তা বলছি? তবে বলি সে দিনের কথা, সেই যে দিন ইংরাজি পড়া বুঝিয়ে নিতে গিয়েছিলে? কি পদ্যটা যেন—

There is a garden in her face
Where roses and white lillies blow—

সরস্বতীর মুখ আবার লাল হইল। সে বিব্রতভাবে বলিল—ওর কথা শুনবেন না মাসীমা। ভারী মিথ্যুক ও।

তাহাকে মিথ্যুক বলাতে সোমনাথ চটিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া বলিল—আমি মিথ্যুক! বলব রববারের সকাল বেলার কথা? বলব আমাকে কি বলেছিলি?

সরস্বতী বাচ্চাকে শরৎসুন্দরীর কোলে শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া গেল। তাহার ভয় হইল মিথ্যুক বলাতে চটিয়া গিয়া সোমনাথ কি বা বলিয়া ফেলে সকলের সম্মুখে। সুতরাং স্থান ত্যাগ করা নিরাপদ।

প্রতিপক্ষকে পলাইতে দেখিয়া সোমনাথ বিজয় গর্বে হাস্য করিল। বলিল—কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছি এক কথায়। আর লাগতে আসবে আমার সঙ্গে?

সোমনাথ যে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া সরস্বতীকে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য করিল তাহা আর গুপ্ত ছিল না। লক্ষ্মীও ইন্দ্রের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে।

সরস্বতী স্কুলে ভর্তি হইয়াছে শুনিয়া ব্রজনাথ আগ্রহ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছিল। বলিয়াছিল—একটু দেখিয়ে না দিলে সরস্বতী ক্লাসের অন্য মেয়েদের সঙ্গে চলতে পারবে না, কতকগুলো নূতন বিষয়ে পড়তে হবে কিনা!

ব্রজনাথের মত সুপণ্ডিত, নামকরা কলেজের অধ্যাপক সরস্বতীর মত একজন স্কুলের নীচু ক্লাসের মেয়ের শিক্ষার ভার লইল ইহাতে ইন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। লক্ষ্মী কথাটা শুনিয়া শুধু মনে মনে হাসিল। সে ভগ্নীর উপর লক্ষ্য রাখিল।

কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্মী ব্রজনাথের আগ্রহের স্বরূপ বুঝিতে পারিল ভগ্নীর ব্যবহারের সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে। ইন্দ্রের কাছে সে কথাটা উঠাইল। বলিল,—আচ্ছা, ব্রজবাবুর সঙ্গে সরীর বিয়ের কথা তুললে কেমন হয়?

ইন্দ্র একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—কথাটা এর আগে তোমার মনে উঠেছিল না সম্প্রতি উঠেছে?

তারপর বলিল—ব্রজবাবু অতি সুপাত্র, তবে সরীর সঙ্গে ওর বয়সের তফাৎ একটু বেশী নয় কি?

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—নিজেদের মধ্যে চার পাঁচ বছরের তফাৎ, সেই হিসাবে তফাৎ বেশী বলছ? সরী ডাগর হয়েছে, ও তফাতে বে-মানান হবে না।

ইন্দ্র বলিল—তা না হয় হল। কিন্তু ব্রজবাবু উচ্চ শিক্ষিত লোক, সরীর মত অল্প লেখাপড়া জানা মেয়ে কি তাঁর পছন্দ হবে? আগেকার রুচি ও নীতি বদলে গিয়েছে আজকাল।

লক্ষ্মী বলিল—তোমার মনের কথা বুঝলাম, এখন এই পর্যন্ত থাক। পরে তোমাকে সব বলব।

ইন্দ্র ও লক্ষ্মীর মধ্যে এই আলাপের পরে সোমনাথ ও সরস্বতীর মধ্যে কলহ হইল। তাহার দিন পনেরো পরে ব্রজনাথ ইন্দ্রকে জানাইল পাঞ্জাব য়ুনিভার্সিটিতে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছে সে, ইন্দ্রের অসুবিধা না হইলে যাইতে চাহে।

ইন্দ্র বলিল—এটা ত মস্ত বড় সম্মানের কথা। আপনি যান, আমার

কোন অসুবিধা হবে না। মাসখানেক পরে আমাকে একবার রাজনগরে যেতে হবে বৈষয়িক কাজের জন্য। তার আগে আপনি ফিরতে পারলে ভালই, না পারলেও কোন অসুবিধে হবে না।

ব্রজনাথ জানাইল দিন দশেকের মধ্যে সে ফিরিতে পারিবে, বড় জোর আরও দুই তিন দিন দেরি হইতে পারে।

ইন্দ্র বলিল—আপনি স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসুন।

ব্রজনাথ বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু নিমন্ত্রণ পত্রে সময় নির্দেশ করিয়া দেওয়া ছিল না। তাহাকে জানানো হইয়াছিল নিমন্ত্রণ গ্রহণে আপত্তি না থাকিলে তাহার সুবিধামত সময় নির্দিষ্ট করিয়া আগে জানাইতে হইবে। ব্রজনাথ ভাবিয়াছিল ভাল করিয়া তৈয়ারী হইয়া মাস দুই পরে বক্তৃতা দিবে। হঠাৎ সে এই সঙ্কল্প পরিবর্তন করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইল আগামী সপ্তাহে সে বক্তৃতা আরম্ভ করিবে। সঙ্কল্প পরিবর্তনের কারণ তাহার অপ্রত্যাশিত মানসিক চাঞ্চল্য।

ইন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে সে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে সরস্বতী স্কুলে ভর্তি হইয়াছে শুনিয়া তাহাকে ক্লাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার ভার লইতে সে একটুও ইতস্তত করে নাই। কিছুদিনের মধ্যে ব্রজনাথ বুঝিতে পারিল যে তাহার মত অবিবাহিত যুবকের পক্ষে একজন বয়স্কা, সুন্দরী, অবিবাহিতা মেয়েকে পড়াইবার ভার লওয়া ঠিক হয় নাই। তাহার মানসিক চাঞ্চল্য কখন ব্যবহারে এক আধটুকু প্রকাশ পাইয়াছে ব্রজনাথ নিজে তাহা বুঝিবার আগে সরস্বতী বুঝিতে পারিয়াছে। একমাত্র সঙ্গী হিসাবে সরস্বতী সোমনাথকে এ সম্বন্ধে দুই একটা ইঙ্গিতপূর্ণ কথাও বলিয়াছে। সে নিয়মিত পড়িতে আসিত, কিন্তু তাহার জড়সড় ভাব দেখিয়া ব্রজনাথ যে দিন হঠাৎ তাহাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বসিল, সরস্বতীর মুখ আরক্ত হইল। বই খাতা ফেলিয়া রাখিয়া সে আনতমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ব্রজনাথ একা ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ ঘরে আসিলে ব্রজনাথ তাহাকে পাঠাইল সরস্বতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য। সে ভাবিয়াছিল সরস্বতী আর আসিবে না।

একটু পরে সোমনাথের সঙ্গে সরস্বতী আসিল। আসিয়া টেবিলের পাশে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজনাথ বলিল—আজ কি আর পড়বে না?

সরস্বতী মুখ তুলিয়া একবার ব্রজনাথের দিকে চাহিল, তারপর বই লইয়া বসিল।

সেদিনকার মত পড়া শেষ হইল। সরস্বতী চলিয়া গেল। ব্রজনাথ আবার ভাবিতে বসিল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে নিজের সঙ্কল্প স্থির করিল। সে মনে করিল কিছুদিন বাহিরে ঘুরিয়া আসিলে নিজের মনের অবস্থা সে সঠিক বুঝিতে পারিবে। দিন তিনেক পরে সে ইন্দ্রের কাছে পাঞ্জাব যাইবার কথা বলিল।

সোমনাথ ও সরস্বতীর মধ্যে আবার তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছে। এবারকার তর্কের বিষয় অন্য প্রকারের। মিকাডোর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রুশ-জাপানী যুদ্ধের বিখ্যাত সেনাপতি নোগুচি হারিকিরি করিয়াছেন। কাগজে এই সংবাদ পড়িয়া সোমনাথ সরস্বতীর কাছে ছুটিয়া আসিল। বলিল—জানিস সরী দি জেনারেল নোগুচি হারিকিরি করেছেন?

জেনারেল নোগুচি কে, হারিকিরি কি ব্যাপার ও কেন তিনি হারিকিরি করিয়াছেন, সামুরাই মানে কি সরস্বতীকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিতে হইল। সব শুনিয়া সরস্বতী বলিল—রাজা মরলেন তাই মনের দুঃখের নিজের পেট কেটে মরলেন! কি বুদ্ধি দেখ।

সোমনাথ উগ্র প্রো-জাপানীজ। সরস্বতীর তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক মন্তব্যে ক্রোধে ও বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার বাকরোধ হইল। তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল—তোমাকে কোন কথা বলাই ভুল। মেয়েছেলের বুদ্ধি আর কত হবে?

এই শ্লেষাত্মক মন্তব্য কানে না তুলিয়া সরস্বতী বলিল,—তোমার ঐ নোগুচি মনে মেয়েছেলে ছিল। পুরুষ মানুষ কখনও আত্মহত্যা করে?

ইহার পর ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল।

ব্রজনাথ পাঞ্জাব রওনা হইবার দিন তিনেক আগে বীরেন্দ্রের সোশিয়ালিষ্ট ক্লাবের বাৎসরিক অধিবেশন ছিল। সেক্রেটারী বীরেন্দ্র ইন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ব্রজনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া ক্লাবে লইয়া গেল।

বাৎসরিক বিবরণী পাঠ ও সভাপতির বক্তৃতার পরে মিটিঙের কাজ শেষ হইল। সভ্যরা এক একখানি টেবিল ঘিরিয়া চার পাঁচজন করিয়া বসিলেন। প্রত্যেকটি দলের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

ব্রজনাথ, ইন্দ্র এবং আরও দুইজন ভদ্রলোক এক টেবিলে বসিলেন। কেক, বিস্কুট ও কফি আসিল। খাওয়া ও আলোচনা চলিতে লাগিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রুধোন, লাসাল, মার্কস ও এঙ্গেলস, সিডনে ওয়েব, বিয়াট্রিস পটার, বার্ণাড শ প্রভৃতি বহু অপরিচিত নাম ইন্দ্র শুনিতে পাইল। পরিচিত নামের মধ্যে কেয়ার হার্ডি, হিণ্ডম্যান ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নাম শুনিল। সায়ান্টিফিক সোসিয়ালিজম ও রিফর্মিষ্ট দলের মধ্যে বিবাদের কথাও সে শুনিল। সোশিয়ালিজম সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকায় আলোচনার তাৎপর্য সে কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝিল যে নিজের দেশের কথা লইয়া এই ক্লাবের সদস্যরা বিশেষ মাথা ঘামান না, কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণীর কথা অনেকবার উঠিল কিন্তু ভারতবর্ষের কথা একবারও কেহ বলিলেন না। ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্রের যতটুকু পরিচয় সে জানিত তাহা বিবেচনা করিয়া সে বুঝিতে পারিল না তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে এই ক্লাবের সভ্য হইয়াছেন। এই ক্লাব কয়েকজন ইংরেজি পোষাক পরা ইংরাজি ভাষায় আলাপকারী, সমাজের উচ্চতর স্তরের ভদ্রলোকের পরস্পরের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, না ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

নীরবে বসিয়া সে সভ্যদের মধ্যে আলোচনা শুনিল, সভা শেষ হইলে ব্রজনাথের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল। সে ভাবিল অবসর মত ব্রজনাথের বা বীরেন্দ্রের কাছে ক্লাবের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

ব্রজনাথ পাঞ্জাব রওনা হইয়া গেল।

ব্রজনাথের লাহোরে পৌঁছিবার খবর যে দিন আসিল সে দিন সন্ধ্যার

পরে শরৎসুন্দরী লক্ষ্মীকে বলিলেন,—বৌমা, একটা কথা বলছি তোমাকে। জীবনে আমার সাধ আহ্লাদ সব শেষ হয়েছে, এখন কেবল দিন গুনছি কবে পরপারের ডাক আসবে। তবু যতক্ষণ শ্বাস আছে কাজের বোঝা কাঁধ থেকে নামে না। মানদা মরে জুড়িয়েছে, আদিনাথের দ্বীপান্তরের খবরটা আসা বাকী আছে। ব্রজ চিরদিন ধীর স্থির, সংসারের আশা ভরসা। ও সংসারী হলে ছোট ছেলেটার জন্য আর ভাবনা থাকে না। এখন আমি যা বুঝি তোমাদের হাতে সব নির্ভর করছে।

লক্ষ্মী অনুমান করিল শরৎসুন্দরী কি বলিতে চাহিতেছেন। সে বলিল,—আমাদের ওপর কি নির্ভর করছে, মাসীমা? কি আপনি বুঝেছেন?

শরৎসুন্দরী কিছুক্ষণ কোন কথা বলিলেন না। তারপর বলিলেন,—ব্রজ হঠাৎ পাঞ্জাবে পালিয়ে গেল কেন আজ কদিন ধরে ভাবছি বৌমা, গোবিন্দজী জানেন আমার অনুমান ঠিক কিনা। মনে ত হয় ঠিক। তাহলে তোমাদের আপত্তি না থাকলে তোমার বোনটিকে আমি চাইব বৌমা।

লক্ষ্মী ডাকিল—সরী! এদিকে একটু শুনে যা ভাই।

পাশের ঘরে সরস্বতী ও সোমনাথ পড়িতেছিল। লক্ষ্মীর ডাক শুনিয়া দুই জনে উঠিয়া আসিল।

লক্ষ্মী বলিল—মাসীমাকে প্রণাম কর সরী।

সরস্বতী হঠাৎ এই আদেশে বিস্মিত হইলেও আদেশ পালন করিল।

সোমনাথ বলিল—সরীদি মাকে প্রণাম করল কেন বৌদিদি? ওর পরীক্ষার রেজাল্ট ত এখনও বেরোয়নি। পাশের খবর পেলে প্রণাম করতে হয়, না?

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—আমরা গোপনে খবর পেয়েছি ও পাশ করেছে। আচ্ছা, তোমরা এবার পড়তে যাও।

তাহারা চলিয়া গেলে লক্ষ্মী বলিল—ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমরা বাবাকে লিখব মাসীমা। এ প্রস্তাবে আমাদের আগ্রহ কম নয়।

শরৎসুন্দরীর প্রস্তাব সম্বন্ধে ইন্দ্র ও লক্ষ্মীর মধ্যে আলোচনা হইল। উভয়ে একমত হইল যে এ সম্বন্ধ ছাড়া উচিত নহে। ব্রজনাথের মনের ভাব কি তাহারা জানে না তবে শরৎসুন্দরীর অনুমান ও সরস্বতীর হাবভাব হইতে তাহা হইতে অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। ইন্দ্র শ্বশুরের মত জানিবার জন্য তাঁহাকে চিঠি লিখিল।

মাতার কোন কথা বা অন্য কোন সূত্র হইতে আভাস পাইয়া সোমনাথ অনুমান করিল তাহার বড়দার সঙ্গে সরী দির বিবাহের কথা চলিতেছে।

সোমনাথ ও সরস্বতী এক ঘরে বসিয়া পড়া তৈয়ারী করিতেছিল। হঠাৎ সোমনাথের কি মনে হইল, বই হইতে চোখ ফিরাইয়া সরস্বতীর দিকে চাহিয়া সে নিজের মনে হাসিতে লাগিল। তাহার হাসি সরস্বতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না দেখিয়া অবশেষে সে বলিল—সরী দি, তোমার আর perseverance বানান মুখস্ত করতে হবে না, তুমি বেঁচে গেলে।

সরস্বতী বই হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়া perseverance ছাড়িয়া endeavour কথার বানান মুখস্থ ক'রতে লাগিল। সোমনাথ বুঝিল সরী দি ইচ্ছা করিয়া তাহার কথা কানে তুলিতেছে না। সে আরও বুঝিল সরীদি কথাটা নিশ্চয় শুনিয়াছে। সে ভূগোল পড়িতেছিল। ভূগোলের পাতায় চোখ রাখিয়া বানান মুখস্থ করিতে লাগিল—m-a-r-r-i-a-g-e ম্যারেজ, ম্যারেজ মানে—এই সরী দি ম্যারেজ মানে কি রে?

সরস্বতীর অটুট গাম্ভীর্য এবার টুটিল। বানান মুখস্থ করা বন্ধ রাখিয়া সোমনাথের দিকে চাহিয়া সে মুচকিয়া হাসিল। বলিল,—তোমার সম্মুখে খোলা ওখানা কি বই, স্পেলিং বুক?

সোমনাথ সোল্লাসে হাততালি দিয়া বলিল—ম্যারেজ কথার মানে তুমি এর মধ্যে জেনে নিয়েছ? তুমি কি চালাক ভাই, সরী দি! সত্যি কি মজা হবে সরী দি বড়দার সঙ্গে—

সরস্বতী একটা আঙুল মুখে চাপিয়া বলিল—চুপ, দাদা সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন।

সরস্বতী আবার endeavour কথার বানান মুখস্থ করিতে লাগিল। সোমনাথ আলাস্কার ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে বীরেন্দ্র আসিল।

বীরেন্দ্র ইন্দ্রকে জানাইল ব্রজবাবু লিখিয়াছেন তিনি কলেজে কিছুদিন ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন, কয়েকটা জায়গা বেড়াইয়া আসিবার ইচ্ছা আছে; আপনাদের কোন অসুবিধা হইলে টেলিগ্রাম করিলে তিনি চলিয়া আসিবেন।

ইন্দ্র বলিল—ব্রজবাবু যতদিন ইচ্ছে বেড়িয়ে আসুন। আমাকে দু'চার দিনের জন্য মাঝে মাঝে দেশে যেতে হয়। আমার দেশের বাড়ীর বিশ্বাসী লোকজন এখানে থাকে, তারা সব চিনে, জেনে নিয়েছে। অসুবিধার কোন কারণ নাই।

কয়েকদিন পরে শরৎসুন্দরীর নামে এক পত্র আসিল।

পত্র লিখিয়াছেন তাঁহার দেবর রঘুনাথ যে জেলে কয়েদ ছিলেন সেই জেলের কর্ত্তৃপক্ষ। জানাইয়াছেন রঘুনাথ অত্যন্ত অসুস্থ। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সে তাহার ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক।

পত্র পাইয়া সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া শরৎসুন্দরী রওনা হইয়া গেলেন। ইন্দ্র দিল্লীর ঠিকানায় ব্রজনাথের নামে এক তার পাঠাইয়া অবস্থা জানাইল। মাতাকে লিখিত ব্রজনাথের এক পত্রে দিল্লীর ঠিকানা ছিল। কিন্তু তার পাঠাইবার আগের দিন সে কাশী রওনা হইয়া গিয়াছে, তার তাহার হাতে পৌঁছিল না।

দিন দশেক পরে সোমনাথের পত্রে ইন্দ্র জানিল রঘুনাথের মৃত্যু হইয়াছে।

রঘুনাথের সর্দি জ্বর হইয়াছিল। থাকিবার সুব্যবস্থা ও জেল ডাক্তারের চিকিৎসার গুণে তাহা নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইল। প্রবল জ্বর গায়ে, বুকে পিঠে ব্যথা লইয়া মেঝেতে কম্বল পাতিয়া সে সারারাত গোঙাইত। মাঝে মাঝে অচৈতন্যের মত পড়িয়া থাকিত। ডাক্তার দরজার বাহির হইতে তাহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া আফিস ঘরে গিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। কয়েকদিন এইভাবে চলিল। তারপর ঘরে অন্য যে কোন কয়েদী থাকিত তাহারা রঘুনাথের অবস্থা ও ডাক্তারের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতে বসিল।

ডাকাতির দাগী আসামী ফয়েজুল্লা বলিল—ঠাকুরের শক্ত ব্যামো হইছে, অচেকেচ্ছায় এনারা ঠাকুরকে মাইর‍্যা ফেলতি চায়। কয় ওডা স্বদেশী ডাকাত। ঐ মানুষ যদি ডাকাত হয় তইলে ফয়জুল্লা মিঞারে কও হাজি সায়েব। সাচ্চা কথা লয় কি তোমরা কও শুনি? আমার মনে লয় ঐ ডাক্তার সুমুন্দির গর্দান পাকড়্যা লিয়্যা আসি ঘরের মধ্যি আর সেডারে কই ছাখ, ভাল কইর‍্যা রুগীরে ছাখ। ডাক্তার হয়্যা এমুন ব্যাভার, কেয়ামতের দিন কি জবান করবা?

পরামর্শ করিয়া স্থির হইল জেলার সাহেবকে ঠাকুরের অবস্থা জানাইতে হইবে।

স্বদেশী ডাকাত ব্রাহ্মণ সন্তান রঘুনাথকে কয়েদীরা ঠাকুর বলিয়া ডাকিত ও যথেষ্ট সম্মান করিত। তাহার ধর্ম্মভাবে ও মিষ্ট ব্যবহারে দাগী কয়েদীদের মধ্যে কেহ কেহ এতদূর তাহার অনুরক্ত হইয়াছিল যে ধরা পড়িলে নিজেদের শাস্তির কথা না ভাবিয়া জেল কর্ম্মচারীদের কাছে ঘুষ কবলাইয়া সাবু, মিশ্রি সংগ্রহ করিত রঘুনাথের জন্য, রাত্র জাগিয়া তাহার শুশ্রুষা করিত। রঘুনাথের প্রতি জেল কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলায় ও নির্ম্মম ব্যবহারে তাহারা এতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে সুবিধা পাইলে জেল ডাক্তার বা জেলারকে আক্রমণ করিয়া শারীরিক শাস্তি দিবার কথা তাহাদের কাহারও মাথায় আসিল।

ফয়েজুল্লার নেতৃত্বে কয়েদীর দল রঘুনাথের কথা জেলারকে জানাইতে গিয়া প্রচণ্ড ধমক খাইল ও তাহাদের সকলেরই কিছু না কিছু শাস্তির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। জেলার স্বয়ং ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া রঘুনাথের অবস্থা দেখিলেন ও তাহাকে তখনই হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ তখন অর্দ্ধ-অচৈতন্য।

পনের দিন হাসপাতালে কাটাইবার পর রঘুনাথের সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কর্ত্তৃপক্ষকে সে তাহার ভ্রাতৃবধূ শরৎসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার

ইচ্ছা জানাইল। তারপর সুস্থ অবস্থায় যেমন গোবিন্দজীর নাম জপ করিত তাহাই করিতে লাগিল।

রঘুনাথের অবস্থা সম্বন্ধে হাসপাতালের রিপোর্ট ও তাহার ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়া জেল কর্তৃপক্ষ কয়েকটা দিন চিন্তায় কাটাইয়া যে দিন শরৎ-সুন্দরীকে সংবাদ পাঠাইলেন সেইদিন শেষরাত্রে রঘুনাথ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল।

দেশের স্বাধীনতা আনিবার সাধনায় উৎসর্গীকৃত একটি জীবন কীটদষ্ট পুষ্প কোরকের মত অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

শরৎসুন্দরী সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। জেলকর্তৃপক্ষের তখনও রঘুনাথের মৃত্যু সংবাদ তাহার আত্মীয় স্বজনকে পাঠাই-বার সময় হইয়া উঠে নাই। তাঁহাদের মুখে সংবাদ শুনিয়া শরৎসুন্দরী পাষাণের মত নিস্পন্দ হইয়া গেলেন।

তারাপুরে ফিরিয়া গোবিন্দজীর মন্দিরে ঢুকিলেন শরৎসুন্দরী। নিঃশব্দে হাহাকার করিয়া গোবিন্দজীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

সোমনাথ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইন্দ্রকে সকল সংবাদ জানাইয়া পত্র দিল ও তাহার বড় দাদাকে খবর দিবার অনুরোধ করিল। তারপর প্রতিবেশীদের সাহায্য লইয়া কাকার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল সোমনাথের বয়স যেন হঠাৎ পাঁচ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে, সেই হাসিখুশী, সদা আনন্দময় ছেলেমানুষ সোমনাথ আর নাই। তাহারা বলিল শোকে মানুষের এই রকম পরিবর্তন হয়, সোমনাথ ছেলে মানুষ হইলেও কাকার মৃত্যুশোক তাহার প্রাণে বড় লাগিয়াছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল কি চূড়ান্ত কষ্ট পাইয়া রঘুনাথ মরিয়াছে।

ইন্দ্র ব্রজনাথকে রঘুনাথের মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া যে তার করিয়াছিল তাহার কোন উত্তর আসিল না।

রঘুনাথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কয়েকদিন ইন্দ্রের মনের বিষন্নতা আর ঘুচিতে চাহে না। রঘুনাথকে সে কখনও দেখে নাই কিন্তু তাহার পরিবারের আর সকলেই তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত হইয়া গিয়াছিল। রঘুনাথের মৃত্যুতে সে আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিল।

সে ভাবিল আজ কি হাওয়া বহিতেছে এই সুবিস্তীর্ণ দেশে, এই আম জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল গাছের ছায়ায় ঘেরা বাংলার আকাশে বাতাসে যে চিরকালের উদাসীন স্বভাব এই জাতির মধ্যে কত গ্রামে কত ঘরে আগুনের ফুল্‌কির মত নূতন নূতন মানুষ জন্মিতেছে? সে জানিত শুধু রাজনগরকে। রাজনগরের পরে আসিল তারাপুর। তারাপুরের একটি পরিবারের বিষাদময় ইতিহাসের মধে সে কি দেশের অগণিত পরিবারের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখিতেছে না?

মনে এই চিন্তা লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে ইন্দ্র খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঘমুক্ত আকাশ তারায় উজ্জ্বল, শীতের হাওয়া গায়ে লাগিল।

উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ ইন্দ্রের মনে হইল পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলর জেলের দৃঢ় লোহার জালে ঢাকা কক্ষ হইতেও কি এই উজ্জ্বল আকাশ দেখা যায়? আন্দামানের নারিকেল গাছের নিবিড় অরণ্যের ফাঁক দিয়াও কি এই উজ্জল অকোশ দেখা যায়? নারিকেল ছিবড়ার দড়ি পাকাইতে পাকাইতে রক্তাক্ত হাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া কি—

সরস্বতী ঘরে ঢুকিয়া ইন্দ্রকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া সন্তর্পণে ডাকিল—দাদা!

ইন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইতে সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—আজ এই চিঠিখানা এসেছে, দিদি দিলেন।

হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি ইন্দ্রের হাতে দিয়া সে চলিয়া গেল। ইন্দ্রের চিঠির উত্তরে ত্রিনয়নী লিখিয়াছেন।

লিখিয়াছেন—কর্তা ক'দিন হল আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি উত্তর দেবেন বলেছিলেন কিন্তু অসুখের জন্য দেরি হচ্ছে বলে আমাকে উত্তর দিতে বললেন।

নাতনী দেখতে কেমন হয়েছে তার দাদু জানতে চেয়েছেন। গায়ের রং কেমন হয়েছে? মুখ চোখ কার মত হয়েছে? দাদুর ইচ্ছে নাতনীর নাম হোক মিনু, ভাল নাম মৃণালিনী, তোদের কি এ নাম পছন্দ হবে? আমি বলেছিলাম যাদের মেয়ে তারাই নাম রাখুক। তিনি শুনলেন না, আমাকে বললেন লিখে দাও। ওদের ইচ্ছে হয় অন্য নাম রাখবে, আমি এই নামেই নাতনীকে ডাকব।

আমাদের বাড়ীতে দু'জন নূতন লোক এসেছে। ঠিক লোক নয়, দুটি বাচ্ছা। আমার ভাইপো গঙ্গারামের কথা মনে আছে বোধহয়? ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় তার দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছিল। দ্বীপান্তর যাবার আগেই সে জেলের পায়খানার মধ্যে গলায় কাপড় বেঁধে মরে সকল যন্ত্রণা জুড়িয়েছে। ছেলে মেয়ে দুটি এতদিন বিধবা মায়ের কাছে ছিল। মাসখানেক আগে হঠাৎ ভেদ-বমি হয়ে সেও মরে বেঁচেছে। একান্ত নিরাশ্রয় ছেলে মেয়ে দু'টিকে এক প্রতিবেশী কিছুদিন নিজের বাড়ীতে রেখে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। পরের বোঝা আর কতদিন বইবেন?

কর্তা বললেন নিজের জন, আশ্রয় দিতে হবে বই কি? আমি যতদিন আছি ভাবনা নেই, তারপর ভগবান দেখবেন।

ভগবান দেখবেন ভরসা করে ওদের রেখেছি। মেয়েটা বোধহয় বছর তেরোর হবে, নাম পুষ্প। ছেলেটার বয়স বছর নয়, নাম হিমাংশু। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে বলে—আমার নাম বোলতা। বোলতার কামড় খাবে?

দুঃখ দুর্দশার মধ্যে মানুষ হলে কি হবে ছেলেমেয়ে দু'টোই সমান দস্যি। ছেলেটা একগাছা লাঠি হাতে নিয়ে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় ইংরাজ মারবার জন্য। বলে, ইংরাজ আমার বাবাকে মেরেছে, ইংরাজ পাজি, আমি সব ইংরাজ মেরে ফেলব। লাঠির ঘায়ে বাড়ীর ছোট ছোট গাছপালার মাথা, ডালপালা ভেঙ্গে সে শেষ করছে। ভাবটা এই যে ইংরাজ মারবার জন্য সে হাতের নিশানা ঠিক করছে। বড় হয়ে এই ছেলের কপালে কি দুঃখ লেখা আছে ভগবান জানেন।

বোনের ডাক নাম ডাহুক। এত রাজ্যের জিনিষ ছেড়ে এক জংলা পাখীর নাম কেন হল ওর জানিনে। ডাহুক দেখেছিস না? খুব সকালে বা সাঁজের আগে বনদুর্গা তলায় দাঁড়িয়ে দেখিস নি কালোপানা বনমোরগের মত পাখী ফুট করে এক ঝোপ থেকে বেড়িয়ে তর্‌তর্‌ করে অন্য ঝোপে ঢুকে যায়। মেয়েটা তরতরে স্বভাবের বটে। মিষ্টি মুখখানার আড়াল থেকে দুষ্টামি সর্বদা উঁকি দিচ্ছে মনে হয়। এই দেখলে এক মনে ঘরের কাজ করছে। তারপরেই দেখবে গোয়ালে ঢুকে বাছুরটার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছে। তারপরের দণ্ডে দেখবে আঁকসি নিয়ে আমড়া পাড়বার জন্য বাগানে দৌড়ুচ্ছে।

দুটো বাচ্চার কথা লিখতে চিঠিখানা বড় হয়ে গেল মা। কি করব, একেবারে অনাথ, নিরাশ্রয়, ওদের কচিমুখ দেখে শত্রুরও মায়া পড়ে, আমরা ত আপনজন।

তারপর সরীর বিয়ের কথা। ব্রজনাথ ছেলে সবদিক দিয়ে ভাল, নিজেও বেশ রোজগার করে। ওঁর মত আছে। আমার কথা তার কি বলব মা? ইন্দ্র ও তুই সবদিক ভেবেই লিখেছিস। সচ্চরিত্র, বিদ্বান ছেলের হাতে পড়ে সরী সুখেই থাকবে যদি ঠাকুরের দয়া থাকে।

রঘুনাথের মৃত্যুর খবর আমরা শুনেছি। তারপর আদিনাথের কথাও ভেবে দেখ। তবে আমি নিজের পরিবারের কথাও ভুলিনি, মা। এক দুঃখী পরিবারের সঙ্গে অন্য দুংখী পরিবারের মিলন—কিন্তু আজকের দিনে কোথায় এই ছোঁয়াচ ছাড়া ঘর পাবো মা?

আমরা মত দিচ্ছি। কর্তার শরীর ভাল নয়। তিনি বললেন যত শীঘ্র হয় ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। তোরা কবে ফিরবি; মিনুদিদিকে বুড়ী-দিদিমার হয়ে চুমা দিস।

নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবে মত জানাইবার জন্য চিঠি লেখা। সেই চিঠিতে অনাথ, নিরাশ্রয় দুইটি বাচ্চার কথা কতখানি স্থান লইয়াছে দেখিয়া ইন্দ্র মনে মনে একটু হাসিল। শাশুড়ী এত লম্বা চিঠি কখনও লিখেন না, দেবুদা ধরা পড়িবার সময় হইতে তাঁহার মুখও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। ভাবিল নিরাশ্রয় বাচ্চা দুইটির নিঃসন্দেহে স্নেহের আশ্রয় মিলিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরে সংবাদপত্রে একটি খবর দেখিয়া ইন্দ্র চমকিয়া উঠিল। কুমিল্লায় অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর গুলির আঘাতে সি, আই, ডি, পুলিশের ইনসপেক্টর রায় সাহেব রাঘব বিশ্বাস নিহত হইয়াছেন; পুলিশ এপর্যন্ত আততায়ীর কোন সন্ধান পায় নাই।

রাঘবের মৃত্যু সংবাদ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের গ্রেপ্তার ও জেলে মৃত্যু, আদিনাথের অন্তর্দ্ধান, মানদার আত্মহত্যা, রাজেনবাবুর গৃহদাহ, তাহার সেবকা-শ্রমের বিরুদ্ধে পুলিশের উদ্যম ও সেবকাশ্রমের বিলোপ, রাঘবের চক্রান্তে রাজনগরের মধুসূদনের কারাদণ্ড—অনেক কথা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য রাজেন বাবুর জনপ্রিয়তার কথা। আরও মনে পড়িল কিশোর রাঘব তাহাদের বালক সমিতির একজন উৎসাহী পাণ্ডা ছিল। বৃদ্ধ, সর্বস্বান্ত রাজেন বাবু এখন কোথায় কে জানে ?

সেদিন দুপুর বেলা মেয়েকে লইয়া রাধারাণী আসিল। নান্টির হাতে একটা ডল, রাধারাণীর হাতে কতকগুলো ফ্রক, লক্ষীর মেয়ের জন্য।

নান্টি সোজা লক্ষীর ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দ্যাখো, বেবীর জন্য ডল এনেছি। বেবী কোথা ?

লক্ষ্মী রাধারাণীকে বসাইল। বলিল—আপনি এসেছেন দিদি বড় ভাল হল। বাড়ীতে লোকজন কম, ভাল লাগছিল না।

নান্টি ততক্ষণ ঘুমন্ত বেবীকে আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা বেবী উঠিয়া ডল লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করুক।

রাধারাণী বলিল—নান্টি, ওর কাঁচা ঘুম ভেঙো না, শরীর খারাপ করবে।

নান্টির আদরে তখন বেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সে চোখ মেলিয়া চাহিল।

নান্টি সোল্লাসে হাততালি দিয়া বলিল—বেবী জেগেছে, জেগেছে ! বেবী ডার্লিং, এই দ্যাখো তোমার জন্য কেমন ডল এনেছি।

সরস্বতী ঘরে ঢুকিল। নান্টির কাণ্ড দেখিয়া সে হাসিতে লাগিল। লক্ষ্মী এবং রাধারাণীও নান্টি ও বেবীর দিকে চাহিয়া হাসিল।

সোমনাথকে লইয়া শরৎসুন্দরী তারাপুর হইতে ফিরিলেন।

শরৎসুন্দরী ব্রজনাথের কথা জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্র—জানাইল সে দিল্লী হইতে রাজপুতানায় গিয়াছে। তাহার কাকার মৃত্যু সংবাদ যে তারে পাঠান হইয়াছিল বোধ হয় তাহা সে পায় নাই। ইন্দ্র নূতন ঠিকানায় আর সে সংবাদ দেয় নাই।

শুনিয়া শরৎসুন্দীর বলিলেন—না দিয়ে ভালই করেছ বাবা। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেড়াক। একদিন খবর ত শুনবেই।

ইন্দ্র দেখিল শরৎসুন্দরী আরও কৃশ ও বার্দ্ধক্যগ্রস্থ হইয়াছেন এই কয়েক

দিনের মধ্যে। কথাবার্তায়, ব্যবহারে কেমন একটা নির্লিপ্তভাব আসিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল তিনি নিজেই ব্রজনাথের বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিবেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিল তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার কথা হইল। লক্ষ্মী বলিল—ওঁকে এখন কিছু বলবার দরকার কি? কথা ঠিক হয়ে আছে। ব্রজবাবু ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে দিন স্থির করতে হবে।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শোকে দুঃখে ওঁর মন সংসার থেকে চলে গেছে। উনি চান তারাপুরে গোবিন্দজীর কাছে ফিরে যেতে। সেদিন আমার কাছে যা বললেন তা থেকে আমার ঐ কথা মনে হল। এক দেখি খুকুকে কোলে বসিয়ে দিলে ওঁর ভাবের পরিবর্তন হয়।

সোমনাথের বিমর্ষভাব দুই চারিদিনের মধ্যে অনেকটা কাটিয়া গেল। ইংরাজি কথার উচ্চারণ বা ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ লইয়া সরস্বতীর সঙ্গে সে আর ঝগড়া বাধায় না, কিন্তু খুকুকে কোলে করিবার দাবি লইয়া প্রায়ই দুইজনে কলহ বাধে। লক্ষ্মীর কাছে আপিলে সোমনাথের জয় অবধারিত জানিয়া সরস্বতী কলহে তেমন জোর দেয় না। কিন্তু তাহাতে সোমনাথের কলহ প্রবৃত্তির উপশম হয় না।

আজ সকালে ঐ দাবি লইয়া কলহের সূত্রপাত হইল। সূত্রপাতে সে লক্ষ্মীর সম্মুখেই সরস্বতীকে বলিল—তোমার ত শিগগির বিয়ে হবে, মেয়েও হবে, তুমি তাকেই কোলে নিয়ে থেকো, মিনুকে আর কোলে নিতে হবে না!

হাত বাড়াইয়া ছুঁইবার ভঙ্গী করিয়া আবার বলিল—তোমার মেয়ে হলে তাকে আমি ছোঁবও না।

সরস্বতী ঝগড়া করিবে কি, উঠিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

ব্রজনাথ ফিরিল।

কাকার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর ইন্দ্রকে বলিল—কাকা যে আর আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন না কেন যেন এই রকম একটা ধারণা কিছুদিন থেকে আমার মনে উদয় হচ্ছিল মাঝে মাঝে। কাকা গেলেন, আদির খবরও আর পাব কি না কে জানে? মা যে কত বড় আঘাত পেয়েছেন তাঁর মুখের দিকে চাইলে বোঝা যায়। কাকা ছিলেন মার প্রথম সন্তানের মত।

ব্রজনাথ ফিরিবার দিন তিনেক পরে বীরেন্দ্র আসিল তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য।

ব্রজনাথ বাড়ীতে ছিল না। তাহাকে না পাইয়া বীরেন্দ্র ইন্দ্রের গৃহে আসিল। ইন্দ্র অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইল।

বীরেন্দ্র বলিল—এত জায়গায় বেড়িয়ে এলেন ব্রজবাবু, ভাবলাম কত রকমের গল্প শোনা যাবে ওঁর কাছে।

ইন্দ্র বলিল—আমারও গল্প শোনা স্থগিত আছে। ফিরে এসেই কাকার মৃত্যু সংবাদ পেলেন। তারপর একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এ পর্যন্ত বিশেষ কথাবার্তা কিছু হয় নি।

বীরেন্দ্র—আমি খবর পেয়েছি দিল্লী, পঞ্জাব প্রভৃতি জায়গার অনেক খবর ব্রজবাবু সংগ্রহ করেছেন। কাজেই মন আর ধৈর্য ধরতে চাইছে না।

ইন্দ্র—ব্রজবাবু অনুপস্থিত, ধৈর্য ধরতে হবে। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার কাছে। যদি অনুমতি করেন কথাটা বলি।

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—অনুমতি করছি, ফায়ার এওয়ে!

ইন্দ্র—আপনাদের ফেবিয়ান ক্লাব না সোশিয়ালিষ্ট ক্লাবে একদিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘণ্টা দুই ক্লাবের সভ্যদের আলোচনা শুনেও সোশিয়ালিজম কি বস্তু, কি উদ্দেশ্যে ঐ ক্লাব হয়েছে কিছু বুঝলাম না। জিনিসটা আমাকে

বুঝিয়ে দিতে হবে। আরেকটা কথা আমার মাথায় এসেছে সে দিন একটা লেখা পড়ে। অভিরাম দেবশর্মা নামে বা ছদ্মনামে একজন ভদ্রলোক বিজয়া কাগজে "ধর্ম ও জাতীয়তা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। রচনাটির মধ্যে কিছু নূতন কথা, অর্থাৎ হয়ত শুধু আমার কাছে, নূতন কথা আছে। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানবার আগ্রহ হয়েছে।

বীরেন্দ্র—কি বলেছেন ভদ্রলোক? কাগজখানা আছে আপনার কাছে?

ইন্দ্র—আছে, কিন্তু কাগজের দরকার হবে না, লেখকের বক্তব্য আমার বেশ মনে আছে।

বীরেন্দ্র—বলুন।

ইন্দ্র—লেখাটার উপলক্ষ্য বলকান যুদ্ধে এদেশের মুসলমানদের উত্তেজনা ও তাঁহাদের তুর্কী প্রীতি। এই উপলক্ষ্য ধরে তিনি এদেশে জাতীয়তা বিকাশের কথা তুলেছেন। তিনি বলছেন—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ধর্মের বাইরের আচার অনুষ্ঠানের ওপর বেশী জোর দেবার ফলে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির বদলে ভৌগোলিক ভিত্তির ওপরে জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারছে না। ধর্মের বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপরে কখনও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এদেশের অনেককে বলতে শোনা যায় ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতবাসীদের মধ্যে কোন প্রকার আন্দোলন সফল হয় না। কিন্তু ধর্মের ওপর বেশী জোর দেবার ফলে জাতীয়তা জন্মায় না, জন্মায় ধর্মান্ধতা। ভারতীয় মুসলমানদের তুর্কী প্রীতির মূলে রয়েছে এই ধর্মান্ধতা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক এদেশে বাস করে বলে যে কোন আন্দোলন এখান হোক, তার ফলে শুধু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পায়। ধর্মের গোঁড়ামি ও বাইরের আচার অনুষ্ঠানের উগ্র গোঁড়ামি যতদিন এদেশের লোকের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে ততদিন এদেশে প্রকৃত জাতি গড়ে উঠবে না। যদি ইণ্ডিয়ান নেশন কখনও গড়ে ওঠে সে নেশন হবে সর্বধর্মাবলম্বীর নেশন।

বীরেন্দ্র আগ্রহের সঙ্গে বলিল—অভিরাম দেবশর্মা যিনিই হউন তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইন্দ্র—আপনি তাহলে ওঁর মত সমর্থন করেন?

বীরেন্দ্র—উনি ত মত প্রকাশ করেননি, সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র। আমাদের এই ধর্ম—ridden দেশে এইটুকু বলতে পারাও সাহসের কথা।

ইন্দ্র—কিন্তু "ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতবাসীদের মধ্যে কোন আন্দোলন সফল হয় না,"—ভদ্রলোক এ কথার প্রতিবাদ করলেও একথা কি ঠিক নয়?

বীরেন্দ্র—হয়ত ঠিক; কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় ইনটেলেকচুয়ালি আমরা কত ব্যাকওয়ার্ড।

ইন্দ্র—বুঝতে পারলাম না।

বীরেন্দ্র—ধরুন আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন করছি, অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করছি। এই আন্দোলনকে যদি ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় একে সফল করবার জন্য,—সফল মানে সাকসেসফুল নয়, বেশী লোকের মধ্যে চালু, লোকের কাছে এট্রাকটিভ করবার জন্য, তাহলে সেটা আর যাই হোক রাজনৈতিক আন্দোলন হবে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে, এখন সে সব কথা থাক। আপনার ঐ অভিরাম দেবশর্মা সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন বটে কিন্তু সমাধানের উপায় সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি।

ইন্দ্র—আমি ঠিক এই কথাটি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।

বীরেন্দ্র—সত্য কথা বলতে কি ইন্দ্রবাবু সমস্যার সমাধান আমিও যে ভেবে পেয়েছি তা নয়। শুধু একটা কথা স্পষ্ট বুঝেছি যে লোককে বোঝাতে হবে পোলিটিকেল এজিটেশন ধর্ম নয়, সেন্টিমেণ্ট নয়, স্পিরিচুয়ালিটি নয়, সনাতন ঐতিহ্য নয়, গোটা কয়েক বেশী চাকুরি, কিছু বেশী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করা নয়, আমাদের পোলিটিকেল আন্দোলনের অর্থ দেশের শাসন ব্যবস্থার ওপর, দেশের সকল প্রকার সম্পদের বিলি ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করবার আন্দোলন। এই আন্দোলনে দেশের জনসাধারণের সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের সাহায্য নেবার পর তাদের বঞ্চিত করবার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই একথা তাদের জানাবার জন্য, আমরা প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে নূতন করে গড়বার প্রতিশ্রুতি দিতে চাই।

আপনি যে সোশিয়ালিজমের কথা জানতে চাইছিলেন সেটা হচ্ছে এই প্রতিশ্রুতি।

ইন্দ্র—আপনি কি বিশ্বাস করেন এই সোশিয়ালিজম আমাদের ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে পারবে?

বীরেন্দ্র—আমার তাই বিশ্বাস। আমাদের আন্দোলনের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম ঢুকাতে পারলে—

ব্রজনাথ ঘরে ঢুকিল।

তাহাকে দেখিয়া বীরেন্দ্র বলিল—এই যে ব্রজবাবু, আপনার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি কতক্ষণ।

ব্রজনাথ একটু হাসিয়া বলিল—যে রকম গম্ভীর আলোচনা চলছিল, তাতে ত কারো অপেক্ষায় বসে রয়েছেন বলে মনে হয় না। আর তিন চার মিনিট মাফ করুন আমাকে, এই আসছি।

সে নিজের বাড়ীতে গেল।

ইন্দ্র বলিল—আমি দেখছি যে দু'টো আন্দোলন আমাদের প্রাণ স্পর্শ করেছে সেই স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন, দু'টোর মধ্যেই ধর্মভাবের প্রেরণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে মন্দটা কি হয়েছে বুঝতে পারছিনে। অথচ বুঝতে পারছি অভিরাম দেবশর্মার ও আপনার কথার মধ্যে সত্য আছে। আপনার সোশিয়ালিজমের আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া ইন্দ্র আবার বলিল—আরেকদিন না হয় এ আলোচনা হবে। সংবাদপত্রে একটা খবর দেখলাম, সেই কথা বলছি। লিখেছে জার্মানী, সুইজারলাণ্ড এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের সিডিশানিষ্ট সমিতিগুলো এ দেশের ছেলেদের দলে আনবার জন্য স্কুল কলেজের ঠিকানায় সিডিশানিষ্ট পুস্তিকা, হাণ্ডবিল প্রভৃতি পাঠাচ্ছে। জুরিখে নূতন একটা সমিতি নাকি হয়েছে। সুইজারলাণ্ড ও য়ুরোপের অন্যত্র যে সকল ভারতবাসী স্বদেশের মুক্তির জন্য কাজ করছেন নূতন সমিতির উদ্দেশ্য তাঁদের সংঘবদ্ধ করা। জার্মানীর কোন জায়গা থেকে "তলোয়ার" নামে একখানা উত্তেজনাপূর্ণ পুস্তিকা কয়েকটা স্কুলের কর্তৃপক্ষ পেয়েছেন। এ সব কথা সত্যি নাকি?

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—সত্যি। একে এ দেশের নানা জায়গাতে "স্বাধীন ভারত", "যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্", "লিবার্টি" পুস্তিকা বিলি হচ্ছে, তার ওপর য়ুরোপ থেকেও ঐ জাতীয় জিনিস আসতে সুরু করেছে। বিপ্লব বিরোধীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শুধু কি এই? গুজব রটেছে জাপানে নাকি একদল ভারতীয় জাপানের সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করছেন। আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরে "যুগান্তর আশ্রম", "গদর" কাগজ ও গদর পার্টির আন্দোলনের কথা ও সেই সঙ্গে লালা হরদয়াল, রামচন্দ্র ও বরকতুল্লার নাম শোনা যাচ্ছে। এদিকে আবার আমাদের পূজনীয় নেতাদের পক্ষে গোদের ওপর বিষ ফোড়া হয়েছে "লেটার বম্ব"।

ইন্দ্র—লেটার বম্ব? সেটা কি ব্যাপার?

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—মারাত্মক কিছু নয়, বোমা মার্কা চিঠি। সোজা কথায় ভয় দেখানো চিঠি। সুরেন্দ্রবাবু, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, মিঃ ভূপেন্দ্র বসু এবং কোন কোন সরকারী কর্মচারীকে ঐ বোমা মার্কা চিঠি লিখে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। চিঠিগুলো সব এক ধরণের আর সবগুলোর গায়ে করাচী পোষ্টাফিসের ছাপ। একই উর্বর মস্তিষ্কের কাজ বলে মনে হয়।

ব্রজনাথ ফিরিয়া আসিল।

ব্রজনাথের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার কথা, সে কোথায় কোথায় গিয়াছিল, কি দেখিল এই সব আলোচনা আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ আলোচনার পরে বীরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল—আজ উঠি, একটু কাজ আছে। আরেক দিন আপনার অভিজ্ঞতার কথা ভাল করে শুনব।

ইন্দ্র বলিল—একটু বসুন বীরেন্দ্রবাবু, আমি এই আসছি।

ইন্দ্র চলিয়া গেলে বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—ইন্দ্র বাবু, অতিথি বৎসল জমিদার মানুষ, তাঁর বাড়ী থেকে মিষ্টিমুখ না করে যাবার উপায় নেই। উত্তর ভারতের খবর কিছু পেলেন ব্রজবাবু?

ব্রজনাথ বলিল—পঞ্জাব, দিল্লী, বেনারসের খবর কিছু পেয়েছি। আসছে রবিবারে আসবেন, কথা হবে।

তিনজনের জন্য খাবার আসিল।

জলযোগ করিয়া বীরেন্দ্র বিদায় লইল। সে যাইবার সময়ে ব্রজনাথ বলিল—কাসাই নদীতে খুব বন্যা হয়েছে খবর বেরিয়েছে, শুনেছেন বীরেন্দ্র বাবু?

বীরেন্দ্র বলিল—শুনেছি। ছেলেরা একটা রিলিফ পার্টি গড়বার জন্য পেড়াপীড়ি করছে।

কয়েক দিন পরে ব্রজনাথ তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া কি কাজ করিতেছে ইন্দ্র ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া ব্রজনাথ এমন চমকিয়া উঠিল যে ইন্দ্র একটু বিস্মিত হইল, অপ্রস্তুত বোধ করিল।

বলিল—আপনি কি বিশেষ ব্যস্ত আছেন?

ব্রজনাথ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল বলিল,—বসুন, বসুন। আমি বিশেষ কেন, কিছুমাত্র ব্যস্ত নই, আপনি বসুন।

ইন্দ্র বসিল। ব্রজনাথও বসিল। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। ইন্দ্র লক্ষ্য করিল ব্রজনাথ ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, কিছু অস্বস্তি বোধ করিতেছে। অন্যমনস্ক ভাবে সে টেবিলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলেও সে আর কোন কথা না বলায় ইন্দ্র বলিল—আপনার মা তারাপুরে ফেরবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। এদিকে আমার শ্বশুর মশায়ের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, তিনি তাগাদা দিয়েছেন। তাই আর একটু দেরি করবার ইচ্ছে থাকলেও কথাটা এখনই পাড়তে হচ্ছে। আপনার মা এ বিষয়ে কিছু বলেছেন?

ব্রজনাথ মুখ না তুলিয়া একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল—কি বিষয়ে?

ইন্দ্র—আপনার বিবাহের সম্বন্ধে! আমার শ্যালিকার সঙ্গে আপনার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম আমরা। তিনি—

বাধা দিয়া ব্রজনাথ খুব তাড়াতাড়ি বলিল—তিনি বলেছেন আমাকে। তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে বলেছেন। সংসার দেখতে অসমর্থ হয়েছেন, বলছেন, তারাপুর যেতে চান বলেছেন। রূপে, গুণে—মানে তাঁর পছন্দের কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের পরিবারের ভগ্নদশা—

মুখ তুলিয়া ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে বলিল—আমাকে কি আপনারা সুপাত্র মনে করেন ?

ইন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া একটু হাসিল।

সোমনাথ ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। ঘাড় ফিরাইয়া সন্ধিগ্ধভাবে উভয়ের দিকে চাইতে চাইতে যাইতেছিল সে। ইন্দ্র তাহাকে ডাকিল। বলিল—সোমনাথ, তোমার বৌদিদিকে গিয়ে বলো আমরা আসছি।

সোমনাথ কি বুঝিল সেই জানে।

হাসিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে ইন্দ্রের বাড়িতে চলিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

শরৎসুন্দরী ইন্দ্রকে বলিলেন—তোমার শ্বশুরকে লিখে যত শিগগির হয় কাজটা শেষ করে ফেলবার ব্যবস্থা কর বাবা, তারপর আমার ছুটি।

ইন্দ্র বলিল—আমি কাল সকালেই চিঠি লিখব।

সরস্বতী লজ্জিত মুখে শরৎসুন্দরী, ইন্দ্র ও ব্রজনাথকে প্রণাম করিয়া দিদির ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। লক্ষ্মী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার মত সুখী হোস মা দুর্গার কাছে এই প্রার্থনা করি। আর কি আশীর্বাদ করব সরী ?

দিদির বুকে মুখ গুঁজিয়া সরস্বতী বলিল—তোমার মত হতে পারি এই আশীর্বাদ কর দিদি।

সোমনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বৌদিদি, সরীদিকে এখন সরীদি বললে কি দোষ হবে ?

হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল—কেন দোষ হবে ভাই ? বিয়ে হয়ে গেলে বৌদি বলবে।

সোমনাথ বলিল—তা বলব। এই সরীদি, আমাকে যে বড় সন্দেশ দিলি না ?

লক্ষ্মী বলিল—তোমাকে আসন পেতে সকলের সঙ্গে দেয়া হবে ভাই। এখন থেকে তুমি আমাদের কুটুম্ব কি না।

সোমনাথের দৃষ্টি অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীর কথায় কান না দিয়া সে বলিল—ঐ দেখুন বৌদি, মিনু জেগে টুলটুল করে চাইছে।

সে মিনুকে কোলে লইবার জন্য অগ্রসর হইল।

লক্ষ্মীও ইন্দ্রের মধ্যে কথা হইল। এইবার রাজনগরে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

লক্ষ্মী বলিল—আগে বাবাকে খবর জানিয়ে দিন স্থির করবার জন্য লেখো।

ইন্দ্র ছোটখাট একটা ভোজের ব্যবস্থা করিতে চাহিল। বীরেন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ব্রজনাথকে সঙ্গে লইয়া সে তাহার গৃহে গেল। বীরেন্দ্রকে পাওয়া গেল না। শুনিল আর্ত্তত্রাণ কাজের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আগের দিন বীরেন্দ্র ঘাটালে চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন বাড়ীর কেহ বলিতে পারিল না।

ব্রজনাথের মনের অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়া গিয়াছে। দিদির আদেশে সরস্বতী আবার তাহার কাছে পড়িতে আসিয়াছিল কাল।

ব্রজনাথের কাছে আবার পড়িবার প্রস্তাবে সরস্বতী লজ্জিতভাবে আপত্তি জানাইতে লক্ষ্মী বলিল—আমার কথা মেনে চল সরী। ব্রজবাবু পণ্ডিত লোক, শহরে থাকেন। তাঁর স্ত্রীর কিছু শিক্ষিত হওয়া দরকার একথা তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন ভাই? তিনি নিজে যখন তোর শিক্ষার ভার নিয়েছেন তাঁর ইচ্ছামত চল। এতে দোষের কিছু নেই, লজ্জা করবার কিছু নেই।

বই খাতা লইয়া সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতী তাহার কাছে পড়িতে আসিলে প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেও ব্রজনাথ মনে মনে আহ্লাদিত হইল। সত্য বলিতে কি এতটা সে প্রত্যাশা করে নাই বা করিতে সাহস পায় নাই।

পড়া শেষ হইলে সরস্বতী যাইবার সময়ে ব্রজনাথ বলিল—তুমি কি রোজ পড়তে আসবে?

সরস্বতী লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করিল, মৃদুস্বরে বলিল—আসবো।

ব্রজনাথ বলিল—আচ্ছা।

সেদিন সন্ধ্যার পরে ব্রজনাথ ইন্দ্রকে তাহার বাড়ী হইতে ধরিয়া আনিল। বলিল—নানা হাঙ্গামায় আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতার গল্প বলা হয়নি আপনাকে। আজ বলব।

খুশী হইয়া ইন্দ্র বলিল—বীরেন্দ্রবাবুও শোনবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তিনি ত ঘাটাল চলে গেলেন। আপনার এই বন্ধুটিকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব পণ্ডিত লোক, এদিকে ভারি অমায়িক। তিনি যে হৃদয়বান ও ও কর্মীলোক স্বয়ং রিলিফের কাজে যাওয়াতে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রজনাথ—বীরেন্দ্র বাবুর সমতুল্য লোক আমার বন্ধুদের মধ্যে আর নেই। মস্ত বড় লোকের ছেলে, অগাধ পয়সা। বিয়েও করেছিলেন খুব বড় লোকের মেয়ে। বছর দু' হল স্ত্রীটি মারা গেছেন।

ইন্দ্র—ভদ্রলোক য়ুরোপের তিনটে দেশের ডিগ্রি নিয়েছেন। এত বড় পণ্ডিত লোক অথচ আমার মত মুর্খের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন আমি তাঁর সমশ্রেণীর লোক।

হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল—আপনি মুর্খ নাকি? এসব কথা এখন থাক, আমার গল্প শুনুন। উত্তর ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করেছি।

ইন্দ্র ভাল করিয়া বসিল। বলিল—কি খবর পেলেন?

ব্রজনাথ বলিল—পঞ্জাবের লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, রাজপুতানার কয়েকটা জায়গা ও কাশীতে ঘুরেছি। ওদিকটাতে কিছু বন্ধু বান্ধব আছে আমার। তাঁদের সাহায্যে ও নিজে নানা রকম দলের লোকের সঙ্গে মিশে খবর সংগ্রহ করেছি। ওদিকটাতে কাজ ভালই চলছে মনে হল। কয়েকটা দলের খবর পেলাম। পঞ্জাব, দিল্লী ও রাজপুতনায় একটা দল কাজ করছে শুনলাম। এই দলের সৃষ্টি করে'ছিলেন লালা হরদয়াল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসরেই তিনি দেশ ত্যাগ করেন। এই দল গড়ে তুলেছেন দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটুটের বাঙালী হেড ক্লার্ক রাসবিহারী বসু। লাহোর বোমার মামলায় ও দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলায় এই দলের কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে। তার ফলে

কিন্তু কাজ বন্ধ হয় নি। রাজপুতানার খবর আমরা খুব কম পাই। উত্তর ভারতের যে দলের কথা বলছি তার মধ্যে রাজপুতানার লোক আছে।

—দ্বিতীয় দল হচ্ছে দিল্লীর নিষ্কলঙ্কী দল। এরা প্রকৃত বিপ্লবী দল নয়। এদের মত ও পথ একটু অদ্ভুত রকমের। শুনলাম ২৫।৩০ বছর ধরে এই ক্ষুদ্র দলটি পৃথিবীতে সত্যযুগ অবতীর্ণ হবার জন্য ও ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করছেন। এঁরা মনে করেন কল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন ও পৃথিবীতে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করবেন। এঁদের ধারণা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবার আর অস্ত্রধারণ করা আবশ্যক হবে না। ভারতবর্ষের শত্রুপক্ষ নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হবে। এই দলের লোকেরা মনে করেন কল্কি অবতারের কাছে ভারতবর্ষের মঙ্গলের ও স্বাধীনতার প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তাঁদের বিশ্বাস শুধু ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনার দ্বারা ঈপ্সিত ফললাভ হবে। শুধু প্রার্থনার শক্তিতে বিশ্বাসী হলেও প্রকৃত বিপ্লবীদের সঙ্গে এঁরা গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। দলের অধিকাংশ লোক ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। খাঁটি সাধু সন্নাসীদের সঙ্গেও এঁদের সংযোগ আছে। উচ্চতর ধর্মজীবনের সাধনার সঙ্গে অহিংস বা বৈষ্ণবীয় মনোভাবের চর্চা এই নিষ্কলঙ্কী দলের বৈশিষ্ট্য বলে মনে হল। এই দলের বালমুকুন্দের দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলায় ফাঁসী হয়েছে।

—তৃতীয় দলটি গড়ে উঠেছে বেনারসে বাঙালী ছেলেদের মধ্যে। এই দলের ছেলেরা একদিকে বাংলার দলগুলি ও অন্যদিকে উত্তর ভারতের রাসবিহারী বাবুর দলের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চেষ্টা করছেন। এই হিন্দু দলগুলি ছাড়া মুসলমান বিপ্লবী দলের কথাও শুনলাম।

ইন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—মুসলমানদের মধ্যে গুপ্ত বিপ্লবীদল আছে না কি?

ব্রজনাথ—তাই ত শুনলাম। এই দলের স্থচনা হয় ১৯১১ থেকে যখন রেডক্রেসেণ্ট সমিতির সভ্য হয়ে একদল ভারতীয় মুসলমান তুর্কীতে গিয়েছিলেন। তুর্কী থেকে প্রচুর ইংরেজ বিদ্বেষ নিয়ে এঁরা দেশে ফিরলেন। গোপনে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করা আরম্ভ হল। ধীরে ধীরে পঞ্জাব থেকে বর্মা পর্যন্ত এই

প্যান ইসলামিক বিপ্লবী দলের কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে শুনলাম। হিন্দুদের মতই এই প্যান-ইসলামিক ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়াতে চান কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাঁরা হিন্দু বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ন'ন। বোঝা গেল এঁরা হিন্দু বিপ্লবীদের সন্দেহের চোখে দেখেন এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চান। তাঁরা নাকি আফগানিস্তানকে কয়েক বার নিমন্ত্রণ করেছেন ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার জন্য।

—তাঁদের চোখ রয়েছে সব সময়ে ভারতবর্ষের বাইরের, স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর ওপর। হিন্দু বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে অনিচ্ছুক হলেও তাঁদের কাছ থেকে বোমা সংগ্রহ করবার আশায় টাকা পয়সা দিয়ে হিন্দু বিপ্লবীদের সাহায্য করেন মাঝে মাঝে।

—মুসলমান বিপ্লবীদের পিছনে তুর্ক গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহানুভূতি রয়েছে শুনলাম। এঁদের দলের কোন কোন লোককে নাকি তুর্ক গভর্ণমেণ্ট কনসাল নিযুক্ত করেছেন। এদেশে তুর্ক গুপ্তচরের আনাগোনার সংবাদ পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

ইন্দ্র—কাগজে এ রকম গুজবের কথা পড়েছি মনে হচ্ছে।

উভয়ের মধ্যে বাংলার বাহিরে বিপ্লবীদলের কাজ ও "গদর" পার্টির সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। ঘড়িতে দশটা বাজিল। ইন্দ্র ভাবিল রাত্র হইয়াছে এবার উঠিতে হইবে।

সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেছে এমন সময়ে নীচে সোমনাথ একবার জোরে বড় দা! বলিয়া ডাকিয়া চুপ করিয়া গেল।

ইন্দ্র ও ব্রজনাথ তাহার ডাক শুনিয়া ব্যস্তভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া অর্ধ পথে দাঁড়াইয়া গেল। সোমনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া একজন লম্বা চুল ও দাড়িওয়ালা লোক উপরে উঠিতেছে।

তাহার দিকে চাহিয়া ইন্দ্র ডাকিল—আদিনাথ!

লোকটি আদিনাথই বটে।

আদিনাথ হাসিয়া বলিল—নাম ধরে ডাকবেন না দাদা, দেয়ালের কান আছে। যাকে ডাকলেন সে লোকটি ফেরারী আসামী।

সকলে ব্রজনাথের পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিল। বসিবার আগে ইন্দ্র ঘরের দরজা দুইটি বন্ধ করিয়া দিল।

আদিনাথ সংক্ষেপে নিজের কথা শেষ করিল। সে বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলার ফেরারী আসামী। গা ঢাকা দিয়া নানা জায়গায় ঘুরিতে ঘুরিতে সে এ দিকটাতে কাজের সন্ধান পাইয়াছে। য়ুরোপে নাকি গোলমাল বাধিবার সম্ভাবনা। এখানে কয়েকজন নেতা নূতন কাজের পত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের চেষ্টার পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। তাহাকে বাংলা ছাড়িয়া লম্বা পাড়ি দিতে হইতে পারে দলের কাজে। বাহিরে যাইবার আগে সকলের সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য আসিয়াছে সে। আজ রাত্রেই কাজ বুঝিয়া লইবার জন্য নূতন কেন্দ্রে যাইতে হইবে তাহাকে।

তাহাকে আটকাইবার চেষ্টা করা বৃথা জানিয়া ইন্দ্র ও ব্রজনাথ সে চেষ্টা করিল না কিন্তু শরৎসুন্দরী ও লক্ষ্মী সহজে নিরস্ত হইল না।

দাদার বিবাহ স্থির হইবার সংবাদে আদিনাথ আনন্দ প্রকাশ করিল। সরস্বতীর সঙ্গে দুই চারিটা হাসি তামাসা করিল, সোমনাথের পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিল, লক্ষ্মীর মেয়েকে কোলে লইয়া লক্ষ্মীর কাছে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিল। তারপর মায়ের কাছে খাইতে বসিয়া অনেক মজার মজার কথা বলিয়া সকলকে হাসাইল।

খাওয়া শেষ হইলে একটু পরে ইন্দ্রকে আড়ালে ডাকিয়া কিছু টাকা চাহিয়া লইল।

লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকিয়া কাতকুতু দিয়া তাহার ঘুমন্ত মেয়েকে জাগাইয়া আদর করিতে করিতে লগিল

একটু পরে লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া বলিল—বৌদি, এবার তাহলে পালাই। আর দেখা হবে কিনা জানিনে তবে যে ভাবেই মৃত্যু আসুক মরবার সময়ে আপনার কথা মনে করবার চেষ্টা করব।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া সে পথে নামিল। ইন্দ্র তাহাকে নির্জন পথ একা চলিতে দিল না। ইন্দ্র, ব্রজনাথ, সোমনাথ ও দুই বাড়ীর জন চারেক ভৃত্যকে লইয়া গঠিত ছোটখাট একটি দল আদিনাথকে মধ্যে রাখিয়া বড় রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে চলিল।

বাড়ী ফিরিয়া ইন্দ্র দেখিল লক্ষ্মীর ঘরে মাটিতে বসিয়া শরৎসুন্দরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহার কাছে বসিয়া আছে।

ইহার দিন পনেরো পরে ব্রজনাথের কাছে ঘাটালে আর্ত্তত্রাণ স্বেচ্ছাসেবক-দলের নায়ক বীরেন্দ্রের গ্রেপ্তারের সংবাদে পাইয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইল। ব্রজনাথের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ হইল। ব্রজনাথ বলিল—সরকারী সাহায্য বিতরণের অব্যবস্থা লইয়া সাবডিভিশনাল অফিসারের সঙ্গে কি গোলমাল বাধিয়াছিল, তাই সরকার বিরোধী প্রচার কার্যের অভিযোগে বীরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দেশের যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তাহার কিছু আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজনৈতিক সংগ্রামের এক নূতন কায়দার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে। ভারতবর্ষের লোক সাগ্রহে এই নূতন আন্দোলনের গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। নেটাল কমিশনের গঠন মনঃপূত না হওয়ায় কমিশন বর্জন করিয়া গান্ধীজী বাংলার স্বদেশী যুগের একস্‌ট্রিমিষ্ট দলের প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইমিগ্রেশন আইন অমান্য করিয়া তাঁহার অনুচরগণ জেলে যাইতে লাগিলেন। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার কারাদণ্ডের সংবাদে এদেশে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল।

গান্ধীজীর সহকর্মী মি. পোলক ও মি. কালেন বাকের গ্রেপ্তারের সংবাদ আসিল। দেশের নরম ও চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার লইয়া প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। কলিকাতার টাউনহলে বর্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় সকল দলের নেতারা যোগ দিয়া গান্ধীজীর আন্দোলন সমর্থন করিলেন ও ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রতিকার দাবি করিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস।

ইন্দ্রের রাজনগরের ফিরিবার আয়োজন আরম্ভ হইল। এই আয়োজনের প্রথম পর্ব বিবাহের বাজার করা। ত্রিনয়নী তালিকা ও টাকা পাঠাইয়া ছিলেন ইন্দ্রের নায়েবের হাতে। নায়েব বাজার ঘুরিয়া জিনিষপত্র কিনিতে লাগিল। স্থির হইল ইন্দ্র চলিয়া গেলে কয়েকদিন পরে ব্রজনাথ শরৎসুন্দরী ও সোমনাথকে লইয়া তারপুরে যাইবে ও সেখান হইতে বিয়ের দুইদিন আগে রাজনগরে পৌঁছিবে।

সোমনাথের এই ব্যবস্থা মনঃপুত হইল না। সে লক্ষ্মীর কাছে দরবার আরম্ভ করিল সরীদি ও মিনুর সঙ্গে সে রাজনগরে যাইবে।

লক্ষ্মী বলিল—তুমি ত বরকর্তা, কনে যাত্রী হতে যাবে কেন ভাই?

সোমনাথ সে কথায় কান দিল না। লক্ষ্মীকে বলিতে হইল—মাসীমাকে বলি, তিনি মত দিলে আমাদের সঙ্গে যেও। তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

সোমনাথ তখন মাকে ধরিল।

শরৎসুন্দরী বলিলেন—ব্রজকে বল। সে রাজি হলে আমার অমত নেই।

সোমনাথ দাদাকে চট করিয়া তাহার প্রস্তাব জানাইতে সাহস করিল না, সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

কয়েকদিন আগে রাধারাণী আসিয়াছিল লক্ষ্মীকে দেখিতে। সেই কথা তুলিয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে বলিল—একটা কথা তোমাকে জানানো হয়নি। দিদির কথার ভাবে বুঝলাম তাঁর রাজনগরে যাবার ইচ্ছে আছে। বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁকে যাবার নিমন্ত্রণ করলে কেমন হয়?

ইন্দ্র বলিল—দেবনাথ দা কি মত দেবেন? কাল কি পরশু আমি নিজে

গিয়ে একবার বলে দেখব। তবে ও বাড়ীতে যেতে মন চায় না। দেবনাথ দা ঘোর মাতাল হয়েছেন আজকাল। শুনি দিনরাত মদ চলে।

লক্ষ্মী বলিল—তা হোক, কাল পরশু একবার যেও।

ইন্দ্রকে যাইতে হইল না। পরদিন দুপুরের আগে মেয়েকে লইয়া রাধারাণী নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার শুষ্ক চেহারা ও অসময়ে তাহাকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মী বুঝিল সম্ভবতঃ বাড়ীতে কোনরূপ গোলমাল হইয়াছে।

সরস্বতীকে ডাকিয়া নাতিকে স্নান করাইয়া, খাওয়াইয়া দিতে বলিল লক্ষ্মী।

নাতিকে লইয়া সরস্বতী চলিয়া গেলে লক্ষ্মী বলিল,—দিদি, আপনি স্নান সেরে নিন।

হঠাৎ লক্ষ্মীকে জড়াইয়া ধরিয়া রাধারাণী কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নিঃশব্দে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল লক্ষ্মী। একবার আঁচল উঠাইয়া নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল সে।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া রাধারাণীর বুকের ভার একটু হাল্কা হইল। লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া দিয়া সে বলিল—হাঁ ভাই স্নান করব বই কি। তার আগে একটা কথা বলা দরকার, দোরটা বন্ধ করে দাও ভাই।

লক্ষ্মী দরজায় ছিটকানি লাগাইল। রাধারাণী ধীরভাবে নিজের কথা বলিল। সে বলিল তাহার স্বামী মাঝে মাঝে বিলাতে টাকা পাঠাইতেন। কেন টাকা পাঠান হয়, কাহার কাছে পাঠান হয় সে কিছুই জানিত না। স্বামীর অপব্যয়ের জন্য বিরক্ত হইয়া অন্য শরিকরা এক জোট হইয়া সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দিয়াছেন। টাকার টানাটানি পড়াতে বোধ হয় বিলাতে টাকা পাঠাইতে পারেন নাই কিছুদিন। এদিকে সারাদিন মদের উপরে আছেন। বাড়ীতে চেঁচামিচি, অশান্তির সীমা নাই। আজ হঠাৎ একখানা বিলাতী তার তাহার চোখে পড়িল। দেখিল রোজ নামে একটি মেম ভয় দেখাইয়া তার করিয়াছে টাকা না পাঠাইলে সে এখানে আসিয়া টাকা আদায় করিবে, সহজে না দিলে নালিশ করিবে। এক স্ত্রী বর্তমানে বিবাহ গোপন করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার অপরাধে তাহাকে জেলে দিবে।

প্রথমে সে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তারপর যখন

সে স্বামীর জঘন্য চরিত্রের কথা বুঝিতে পারিল তাহার মনে হইল আত্মহত্যা করিয়া এই অপমানের জ্বালা জুড়াইবে। মেয়েটার কথা মনে হওয়াতে আত্মহত্যা করিতে পারে নাই। তাহার হাত ধরিয়া এক বস্ত্রে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। মেয়েটাকে লক্ষ্মী যদি আশ্রয় দেয় সে নিজের ব্যবস্থা যাহা হয় একটা করিয়া লইবে। শেষ আশ্রয় গঙ্গা ত আছেন।

লক্ষ্মী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ওকথা মুখে আনবেন না দিদি। ভগবান একটা উপায় করে দেবেন। আপনি নিজের জনের কাছে এসেছেন, আমাদের ওপরে আপনার কি কোন দাবি নেই ?

তাহাকে জোর করিয়া স্নান করিতে পাঠাইল লক্ষ্মী। স্নান শেষ হইলে জলযোগ করাইয়া নিজের ঘরে আনিয়া মিনুকে তাহার কোলে দিল। বলিল, —আপনি একে রাখুন একটু, আমি স্নান সেরে আসি।

স্নান করিবার আগে সে ইন্দ্রকে আড়ালে ডাকিয়া সব কথা জানাইল। বলিল—আমি বলি কি দু'চার দিন যাক, তার পর ওঁর মনের অবস্থা বুঝে যা হয় করা যাবে। তুমি কি বলো ?

ইন্দ্র বলিল—সেই ভালো। তবে উনি যখন নিজে থেকে এখানে এসে উঠেছেন আনি যেতে বলতে পারব না। মানদার কথা মনে আছে আমার। আমি পঞ্চক্রোশীতে একটা টেলিগ্রাম করে ব্যাপার জানাচ্ছি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সরস্বতী ও সোমনাথের মধ্যে কথা হইতেছিল। রাধারাণী এবং লক্ষ্মীও সেখানে ছিল। আলোচনার বিষয় বাংলার একটি সামাজিক ব্যধির মর্মান্তিক আত্মপ্রকাশ। দিনকয়েক আগে সংবাদ পত্রে স্নেহলতার আত্মহত্যার মর্মান্তিক করুণ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। আপনার দেহে লুক্কায়িত ব্যাধির বীভৎস প্রকাশ দেখিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সোমনাথ লক্ষ্মীকে বলিল—বৌদিদি, সরীদির বিয়েতে আপনারা দাদাকে এক পয়সা দেবেন না। দিলে আমি এ বিয়েতে যাব না বলে দিচ্ছি।

লক্ষ্মী বলিল—তোমার দাদা ত কিছু চান নি, ভাই। দেশের সব ছেলেরা তোমার দাদার মত হলে অভাগিনী স্নেহলতাকে কি এমন করে মরতে হত ?

ব্রজনাথের গৃহে ইন্দ্র, ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্রের মধ্যে আলাপ হইতেছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপের ফলে মুক্তি পাইয়া বীরেন্দ্র ঘাটাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বীরেন্দ্রের গ্রেপ্তারে স্বেচ্ছাসেবক দলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়, কাজকর্ম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। অবস্থা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন।

বীরেন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিল। সে বলিল—আমাদের দেশের লোকের চরিত্রের এত অধোগতি হয়েছে ব'লে ইংরাজ কর্মচারীরা যা ইচ্ছে করতে সাহস পায়। কে খয়রাতি সাহায্য একটু কম পেল, কে একটু বেশী পেল এই নিয়ে খেয়োখেয়ি লেগেই রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা নাকি যে বাড়িতে অল্পবয়সের মেয়ে আছে সে বাড়িতে বেশী সাহায্য দেয়, ঔষধ দেবার অজুহাতে যুবতী মেয়েদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে—এই সব অভিযোগ গভর্ণমেণ্টের লোকের কাছে করা হয়। রিলিফের চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাদি বেশী দামে বেচে দেবার ব্যবসায়ও চলে গোপনে। কয়েকটা ব্যাপার ধরা পড়াতে বদমায়েসগুলো চটে গিয়ে সাব-ডিভিশানাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বেনামী দরখাস্ত পাঠায়। অথচ কত লোক যে সর্বস্বান্ত হয়েছে, কতলোক আমাশয়ে, জ্বরে ভুগছে তাব ইয়ত্তা নেই। এক কলেরাতেই কত লোক মরেছে। রিলিফ না দিলে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যেত।

ইন্দ্র বলিল—আপনার দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা ফিরে আসতে চাইল না আপনার সঙ্গে?

বীরেন্দ্র—তারা ফিরে আসবার জন্য তৈরী হয়েছিল, অনেক কষ্টে থামিয়েছি। যাদের শরীর খুব খারাপ হয়েছিল এমন কয়েকজন চলে এসেছে।

একটু থামিয়া বীরেন্দ্র আবার বলিল—ক্ষুদে সরকারী কর্মচারীদের মোড়লীতে কাজ করা আরও বিরক্তিজনক মনে হয়। আমার কাছে ধমক খেয়ে কয়েকজন ত রীতিমত শত্রু হয়ে দাড়িয়েছিল।

ব্রজনাথ—এখন কি করবেন? ঘাটালে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে?

বীরেন্দ্র—ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে, তবে গেলে অন্য কোন কেন্দ্রে যাব, ঘাটালে আর যাব না। তার আগে শরীরটা ঠিক করে নিতে হবে। দিনরাত জল কাদার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে শরীরটা বে-জুত হয়েছে, খাটুনিও গিয়েছে খুব।

ইহার পর য়ুরোপে যুদ্ধের আতঙ্ক, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল।

ব্রজনাথের বিবাহের কথা উঠিল। বীরেন্দ্র বলিল—আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। শরীরটা খারাপ হয়ে না পড়লে এই উপলক্ষ্যে আপনার দেশে আর একবার ঘুরে আসতাম, বিয়ের ভোজটাও খেতাম।

ব্রজনাথ বলিল—আপনার শরীর এর মধ্যে ভাল হয়ে যাবে। আপনি গেলে কত যে খুশী হব—

বীরেন্দ্র—ওয়েল, ওয়েল, যেতে পারলে আমিও খুশী হব। শরীরটা কিছু ভাল বোধ করলে বরযাত্রী হবার আশা রাখি।

তাহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিল। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে বীরেন্দ্র বিদায় লইল।

ইন্দ্রের নায়েব জিনিসপত্র কিনিয়া রাজনগরে ফিরিয়া গিয়াছে। রওনা হইবার আর দিন তিনেক বাকী।

পঞ্চক্রোশী হইতে ইন্দ্রের তারের উত্তরে তার আসিল দেবনাথের স্ত্রীকে পঞ্চক্রোশীতে আনিবার জন্য লোক রওনা হইয়াছে। উত্তর আসিবার পরদিন লোক পৌঁছিল। এদিকে দেবনাথের এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল সাহেবের খুব অসুখ, মেম সাহেবকে সে লইতে আসিয়াছে। ইন্দ্র লক্ষ্মীকে খবর জানাইল।

রাধারাণী সব শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল। বলিল—ঠাকুরপো যখন পঞ্চক্রোশীতে সংবাদ দিয়ে লোক আনিয়েছেন আমি পঞ্চক্রোশী যাব, ও বাড়ীতে ফিরব না। অসুখের কথা একটা ছল, আমি জানি।

লক্ষ্মী তাহাকে অনেক বুঝাইল। বলিল—দিদি, নান্টি তার বাপের কাছে যাবার জন্য বায়না করলে তার কি উপায় করবেন? ও যে বাপকে ভালবাসে।

শরৎসুন্দরী আসিয়া বুঝাইতে বসিলেন। কিন্তু বুঝাইতে গিয়া তাঁহার কথা কেবল বাধিয়া যাইতে লাগিল। একজনকে ত তিনি অনেক যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া, ভৎর্সনা করিয়া, শেষে জোর করিয়া স্বামীর ঘরে পাঠাইয়াছিলেন। আনন্দা বলিয়াছিল—আমার মন ভেঙে গেছে, আমি আর ওখানে যাব না।

ভর্ৎসনা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—স্বামীর ঘরে একটু দুর্ব্যবহার পেয়েছে অমনি মেয়ের মন ভেঙ্গে গেছে! মেয়ে মানুষের মন কি অত সহজে ভাঙ্গলে চলে? তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে কালের পরিবর্তন হইয়াছে। মর্মান্তিক উপায়ে মানদা সে কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে তাঁহাকে।

রাধারাণী লক্ষ্মী ও শরৎসুন্দরীর কথায় নিজের মত পরিবর্তন করিল না। লক্ষ্মীকে সে বলিল—ভগবান তোমাকে সুখী করেছেন বোন, আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না। ভগবান করুন তোমার সুখ অক্ষয় হোক, আমাকে আর কিছু বো'ল না।

শরৎসুন্দরীর পায়ে হাত দিয়া সে বলিল—আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন একটু শান্তি পাই। পঞ্চক্রোশী গিয়ে যাঁদের মেয়ে তাঁদের কাছে ছেড়ে দিয়ে আমি বাবার কাছে চলে যাব।

ইন্দ্র দেবনাথের ভৃত্যের হাতে একখানি চিঠি পাঠাইল দেবনাথকে—বৌঠান পঞ্চক্রোশী যাইতেছেন। আপনি স্বয়ং আসিয়া যদি তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, আমাদের অনুরোধ তিনি রাখিলেন না।

চিঠি পড়িয়া একটা অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করিয়া দেবনাথ উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। পরের দিন রাধারাণী পঞ্চক্রোশী রওনা হইয়া গেল।

রাজনগরে ফিরিবার আগের দিন ইন্দ্র ব্রজনাথকে সঙ্গে লইয়া বীরেন্দ্রের গৃহাভিমুখে রওনা হইল। যাইবার আগে অসুস্থ বীরেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করিবার ও তাহাকে রাজনগরে যাইবার জন্য আর একবার অনুরোধ করিবার ইচ্ছা ছিল তাহার।

বীরেন্দ্রের গৃহে পৌঁছিয়া যে খবর পাওয়া গেল উভয়ে স্তম্ভিত হইল তাহাতে। শুনিল গত শনিবার বিকালের দিকে বীরেন্দ্র দুই তিন দিনের জন্য কোথায় যাইতেছে বলিয়া কাপড় চোপড় ও বিছানা পত্র লইয়া চলিয়া যায়। শনিবার শেষরাত্রে পুলিশ বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে ও সকাল হইতে তল্লাস করিতে আরম্ভ করে।

তল্লাসীর ফলে বীরেন্দ্রের পড়িবার ঘরের ছেঁড়া কাগজ ফেলিবার ঝুড়ি হইতে নাকি পুলিশ ছেঁড়া চিঠির টকরায় অনুশীলন সমিতির নাম ও দিল্লীর

ষড়যন্ত্রের মামলার পলাতক আসামী রাসবিহারী বসুর নাম পাইয়াছে। বীরেন্দ্র এপর্যন্ত ফিরে নাই, ফিরিলে পুলিশ তখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে সন্দেহ নাই। রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সম্মুখে শাদা কাপড়ে দুইজন পুলিশ সব সময়ে বসিয়া থাকে।

বীরেন্দ্রের ছোট ভাই বলিল—আমারাও হাবড়া ও শেয়ালদা ষ্টেশনে চব্বিশ ঘণ্টা লোক বসিয়ে রেখেছি দাদাকে দেখতে পেলে সাবধান করে দেবে।

ফিরিবার পথে ইন্দ্র বলিল—বীরেন্দ্রবাবু সোশিয়ালিষ্ট মতে বিশ্বাসী বলে জানতেম।

ব্রজনাথ বলিল—তিনি সোশিয়ালিষ্ট মতে বিশ্বাসী, তবে ফেবিয়ান মতের সোশিয়ালিষ্ট নয়। তিনি আপনাকে বলতেন রেভোল্যুশনারী সোশিয়ালিষ্ট। অর্থাৎ, তাঁর মতে সোশিয়ালিজম আনতে হবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা নয়। বাইরের লোককে একথা তিনি জানাতেন না।

ইন্দ্র বলিল—এদিকে অনুশীলন সমিতি ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল জানা যাচ্ছে।

ব্রজনাথ—সেটা কতটা সত্যি বলা যায় না। তবে অনুমান হয় সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার জন্য দেশে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার মনে করতেন।

ইন্দ্র—একটা কথা আমার মনে এল, আপনাকে বলছি। আদিনাথের কাহিনী ও বীরেন্দ্রবাবুর এই ব্যাপার থেকে মনে হয় বড় একটা তোড়জোড় চলছে দেশে যার খবর আমরা রাখিনে।

ব্রজনাথ—কথাটা আমার মনেও উকি দিয়েছে। কে জানে য়ুরোপের আকাশে যে কালো মেঘ জমেছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে দেশে নূতন কোন উদ্যম আরম্ভ হয়েছে কি না?

ইন্দ্রও সেই কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পঞ্জাবে, মাদ্রাজে, দিল্লীতে যে উদ্যম বিচ্ছিন্নভাবে দেখা গিয়াছে এবার তাহাকে সংহত করিয়া প্রচণ্ড আঘাত জানিবার দুঃসাহসিক অভিযান আরম্ভ হইবে কি?

বীরেন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধানে তাহারা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিল। ফিরিবার সময় উভয়ে নিজের মনে চিন্তায় মগ্ন রহিল।

১৫

কলিকাতার বাস উঠাইয়া ইন্দ্র সপরিবারে রাজনগরে রওনা হইল।

সকাল ৭ টায় গাড়ী অতি পরিচিত, অতি প্রিয় রাজনগর রোড ষ্টেশনে থামিল।

ইন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া একবার চারিদিকে চাহিল। প্রভাব সূর্যের আলোকে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া মনে মনে বলিল—আঃ! এতদিন পরে!

নায়েব আসিয়া প্রণাম করিল, আজাহার সর্দারের পুত্র দেরাজ মাটিতে লাঠি রাখিয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল।

একমুখ হাসিয়া দেরাজ বলিল—হুজুর আইল্যান! বাপজান আসতি মন করছিল, বাতের ব্যামো বাড়িছে, হাঁটতি পারে না, তাই মানা করলাম।

ষ্টেশন মাষ্টার মল্লিক মশাই ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন।

সোমনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে তাহার জিদ বজায় রাখিয়াছে। দাদার কাছে অনুমতি আদায় করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় নাই।

লক্ষ্মীর কাছে গিয়া সে বলিল,—বৌদিদি, আপনাদের রাজনগর কোনদিকে?

লক্ষ্মী দিক নির্দেশ করিয়া দেখাইল, তারপর কি ভাবিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইল বহু মাঠ, শস্যক্ষেত্র, বাগান, বসতির ওপারে তিন মাইল দূরে অবস্থিত রাজনগরের উদ্দেশ্যে।

সকন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইখানা পাল্কীতে রওনা হইল, দেরাজ পাল্কীর সঙ্গে চলিল। সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া সজ্জিত মহিষের গাড়ীতে উঠিল ইন্দ্র।

মহিষের চেহারা দেখিয়া সোমনাথ অবাক। বলিল—এযে হাতীর মত মোষ। তারাপুরের মোষ এর অর্দ্ধেকও নয়। লোকে বলে খিয়েরের গরু মোষ সব ছোট হয় আর মানুষ হয় শুকনো।

বারোয়ারী কালীবাড়ীর নাটমন্দির ডাহিনে রাখিয়া ইন্দ্রের গাড়ী যখন বাঁদিকে ঘুরিয়া গ্রামের পথ ধরিল পোষ্টাফিসের বারান্দা হইতে উমানন্দ

চেঁচাইয়া বলিল—দিদিরা কতক্ষণ পৌঁছেছে, আপনার এত দেরি হল জামাইবাবু!

গাড়ীর মধ্যে সোমনাথকে দেখিয়া সে বলিল—আপনার সঙ্গে ও কে জামাইবাবু?

হাসিয়া ইন্দ্র বলিল—ইনি বরকর্তা, বড় কড়া মেজাজের লোক হে আনন্দ। এঁর সামনে সাবধান হয়ে চলবে।

গাড়ীর মধ্যে সোমনাথ ইন্দ্রের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া ইন্দ্র দেখিল বৈঠকখানার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া জীবানন্দ নাতনীকে কোলে করিয়া আদর করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাহার গলায়, হাতে, পায়ে নূতন অলঙ্কার উঠিয়াছে। জীবানন্দের চেয়ারের হাতল ধরিয়া একটি মেয়ে মিনুর দিকে ঝুঁকিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ইন্দ্র ও সোমনাথকে দেখিয়া মেয়েটি চেয়ারের হাতল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে সরিয়া গেল। কি ভাবিয়া তখনই আবার আগাইয়া আসিয়া ইন্দ্রকে প্রণাম করিল।

সোমনাথ ইন্দ্রের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। একবার তাহার দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

জীবানন্দ বলিলেন—ওর নাম পুষ্প। দেখে যত ঠাণ্ডা মনে হল অত ঠাণ্ডা ও নয়।

সোমনাথের পরিচয় পাইয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিলেন—এসো বাবা, তোমার মুখখানা দেখে আমি কত যে আশ্বাস পেলাম।

তারপরে ডাকিলেন—ওরে পুষ্প, সোমনাথকে ভেতরে লক্ষ্মীর কাছে নিয়ে যা।

সোমনাথ দেখিল সেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সোমনাথের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

জীবানন্দ আবার ডাকিলেন—কই রে এলি? সোমনাথকে নিয়ে যা সঙ্গে ক'রে।

মেয়েটি দরজা পর্যন্ত আসিল। বলিল—আমি ত দাঁড়িয়ে আছি দাদু, ও আসুক না।

তাহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র ও জীবানন্দ হাসিলেন।

সরস্বতী আসিয়া বলিল—বাবা, মিনুকে দিন, ওর খাবার সময় হয়েছে।

মিনুকে কোলে লইয়া সোমনাথের হাত ধরিয়া সরস্বতী বলিল—দিদি তোমার খোঁজ করছেন, এসো আমার সঙ্গে।

পুষ্প তাহাদের পিছনে চলিল। চলিতে চলিতে বলিল—আমি ডাকলেম বাবুর আসা হল না।

সোমনাথ ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসি চাপিয়া বলিল—তুমি ডেকেছিলে নাকি? আমি ত শুনতে পাইনি।

মুখ গম্ভীর করিয়া পুষ্প বলিল—শুনতে পাওনি, দেখতে পেয়েছিলে ত?

সরস্বতী ধমকাইয়া বলিল—হাঁরে পুষ্প, এর মধ্যে ওর সঙ্গে লাগতে এসেছিস?

পুষ্প ধমক খাইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, সোমনাথ ও সরস্বতী চলিয়া গেল।

দুই এক দিনের মধ্যে সোমনাথ, উমানন্দ, পুষ্প ও তাহার ভাই হিমাংশু একটি দল গড়িয়া উঠিল। রাজনগরের যেখানে যে দ্রষ্টব্য আছে এই এই দল সকালে বিকালে সে সকল জায়গায় অভিযান করিতে লাগিল।

সোমনাথ দলের বয়োজ্যেষ্ঠ। সুশ্রী চেহারা, সুমিষ্ট ব্যবহার, সরল কৌতুক প্রিয়তা ও স্বভাবগত আন্তরিকতা গুণে লোককে আকৃষ্ট করিত সে। তাহার উপর সে চমৎকার গল্প বলিতে পারিত এবং নানা সূত্রে সংগৃহীত তাহার গল্পের ভাণ্ডারও ছিল বৃহৎ। সুতরাং ক্ষুদ্র দলটির উপর তাহার প্রতিপত্তির সীমা রহিল না।

উমানন্দ ও সর্বদা ইংরাজ নিধন অভিলাষী, দুর্দান্ত হিমাংশু তাহার হিংস্র স্বভাব সংবরণ করিয়া সোমাসাথের ভক্ত হইল। ইংরাজ নিধন কার্যে বেতের ছড়ি, বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল অপেক্ষা পিস্তল ও বোমা অধিক কার্যকরী

সোমনাথের কাছে এই তথ্য জানিতে পারিয়া কলিকাতা হইতে কয়েকটি পিস্তল ও বোমা তাহাকে পাঠাইবার জন্য সে সাগ্রহ আবেদন জানাইল সোমনাথের কাছে। কিন্তু দলের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের উপর সোমনাথের নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া এক দুর্বোধ্য রহস্য বলিয়া মনে হইল। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ একক পুষ্পাকে লইয়া গঠিত।

পুষ্প বাক্যে দলের নেতার প্রতি প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। আর আচরণে, হাঁ তাহার আচরণ ছিল বেশ একটু হেঁয়ালিভরা। ছোট দলটির মধ্যে মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিবার মত বয়স কাহারও হয় নাই। তাই তাহার আচরণের ফলে পুষ্পের ঝগড়াটে বলিয়া অখ্যাতি আরও একটু বাড়িল।

পুষ্প দল ছাড়িত না আবার দলের সকলের সঙ্গে যখন ঝগড়া করিতেও ছাড়িত না। একদিন তাহার অকারণ কলহ প্রিয়তায় বিরক্ত হইয়া উমানন্দ বলিল—তুমি আর আমাদের সঙ্গে এসো না। মা বলেছেন তুমি বড় হয়েছ, বেশী পাড়ায় বেড়ানো ভাল না।

রুষ্টস্বরে পুষ্প বলিল—বেশ করব বেড়াব। যাও, তোমরা চলে যাও। আমি একা একা বেড়াব।

একা বেড়াইবার সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়া সে হন হন করিয়া একদিকে চলিতে থাকে। সোমনাথ তাহাকে শান্ত করিবার জন্য অগ্রসর হয়। বলে—পুষ্প রাগ করো না। আমাদের সঙ্গে এসো।

পুষ্প তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিতে থাকে। সোমনাথ পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলে, বলে—এসো লক্ষীটি।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প তীব্রস্বরে বলে—আমার হাত ছেড়ে দাও, নইলে আঁচড়ে দেব এখুনি।

হিমাংশু ডাকিয়া বলে—দিদিটা সত্যি বেড়ালের মত আঁচড়ে দেয় সোমনাথ দা, ওকে ধরবেন না। সে দিন আমার এইখানে আঁচড়ে দিয়েছিল।

সে হাত দিয়া নিজের বাম স্কন্ধ দেখাইল।

সোমনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিয়া বলিল—সত্যি এখনও তোমার আঁচড়াবার কামড়াবার অভ্যাস আছে? পালাই তা'হলে।

উমানন্দ ও হিমাংশুকে লইয়া সোমনাথ চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মাথা নীচু করিয়া ধীর পদক্ষেপে পুষ্প আসিতেছে। কি ভাবিয়া সোমনাথ সেখানে দাঁড়াইল। উমানন্দকে বলিল—আনন্দ, তুমি আর হিমাংশু এগিয়ে যাও, আমি ওকে নিয়ে আসছি। বাড়ী গিয়ে তোমার নামে নালিশ না করে আবার, ও যা মেয়ে।

সোমনাথকে দাঁড়াইতে দেখিয়া পুষ্প দাঁড়াইল। সোমনাথ ডাকিয়া বলিল—পুষ্প এসো।

পুষ্প আসিল না। সোমনাথ তাহার কাছে গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল পুষ্পের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

ব্যস্ত হইয়া সোমনাথ বলিল—কি হয়েছে পুষ্প, কাঁদছ কেন?

পুষ্প আঁচল তুলিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। বলিল—আমি কি সত্যি তোমাকে আঁচড়াতাম? কেন আমাকে ও কথা বললে?

সোমনাথ হাসিল। বলিল—তুমি এত শক্ত শক্ত কথা বলতে পারো আর আমার এই হাসির কথায় কান্না পেল? কি ছেলে মানুষ তুমি! এসো, এসো, ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

পুষ্প সোমনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—যাক্। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

সোমনাথ হাসিয়া বলিল—বেশ, চলো।

কলহ ও সন্ধি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

ত্রিনয়নীর মুখে সোমনাথ পুষ্প ও হিমাংশুর কাহিনী শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাহার মন ভাই বোন দুইটির প্রতি গভীর সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়াছিল।

হিমাংশুকে তাহার বড় ভাল লাগিত। ঐটুকু ছেলের মনে কি প্রবল ইংরাজ বিদ্বেষ। যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে সে এই বিদ্বেষ প্রকাশ করিত অন্যের কাছে তাহা কৌতুকের বিষয় ছিল। সোমনাথ ভাবিত ইহা ত স্বাভাবিক। বড় হইয়া বাঁশের কঞ্চির অস্ত্র ছাড়িয়া সে যখন রিভলবার তাক করিবে তখন কেহ আর কৌতুক বোধ করিবে না। কলিকাতা হইতে কয়েকটা পিস্তল ও বোমা পাঠাইবার জন্য প্রায় প্রতিদিনই সে সোমনাথে কাছে আবেদন

জানাইত। সোমনাথ ভাবিত সে না পাঠাইলেও বড় হইয়া হিমাংশু নিজেই উহা যোগাড় করিয়া লইবে।

পিতার অকাল মৃত্যুর জন্য পুষ্পের মনেও খুব ইংরাজ বিদ্বেষ আছে; কিন্তু ও বড় চাপা মেয়ে। সহজে মনের কথা প্রকাশ করে না। আবার যখন মনের ভাব প্রকাশ করে প্রকাশের ভাষা এমন গোলমেলে হয় যে তাহার প্রকৃত মনের ভাব ধরা কঠিন হয়।

সোমনাথের মনে পড়িল কাল বিকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময়ে পুষ্পের একটা কথা।

পথের পাশে জঙ্গলের মধ্যে ভাঁটফুল দেখিতে পাইয়া পুষ্প জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ভাঁটফুল আনিতে ছুটিল। একটা ডাল ভাঙ্গিয়া হাতে লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। ভাঁটফুলের কেমন সুন্দর গন্ধ শুঁকিয়া দেখিবার জন্য সে ডালটি সোমনাথের নাকের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে এমন সময় একটা লাল পিঁপড়া তাহার হাতে কামড়াইল। যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া ডালটা মাটিতে ফেলিয়া দিল সে।

উমানন্দ বলিল—জঙ্গলের মধ্যে যেমন ফুল আনতে গিয়েছিলে তেমনি বোঝ।

আনন্দের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া সে বলিল—বেশ করেছি। তোমাকে ত কামড়ায় নি। এই দেখো আরও ফুল আনছি।

তাহাকে আবার জঙ্গলে ঢুকিতে উদ্যত দেখিয়া সোমনাথ বলিল—দাঁড়াও, আমি ফুল এনে দিচ্ছি।

একরাশ ফুল সুদ্ধ ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া সে পুষ্পের সম্মুখে ধরিল। পুষ্প খুশী হইয়া ফুল লইল। তারপর উমানন্দের দিকে আবার ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে আমি যাবো না, তুমি চলে যাও।

হিমাংশু মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া ডালটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল—চলো আনন্দ দা, আমরা যাই। দিদিটা পড়ে থাক।

তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইলে পুষ্প ভাঁটফুলের ডালটি দোলাইতে দোলাইতে বলিল—চলো এবার।

বাড়ী ফিরিতে প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিল। পুষ্প সোমনাথের গা

ঘেঁষিয়া চলিতেছিল। হঠাৎ পুষ্প বলিল—সোমনাথ দা, তুমি খুব ভাল। তোমার সঙ্গে আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবে?

বিস্মিত হইয়া সোমনাথ পুষ্পের মুখের দিকে চাহিল।

পুষ্প অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে লাগিল।

একটু পরে নিজের মনে হাসিয়া বলিল—দেখলে কেমন বললাম। নিয়ে যা যাবে আমি জানি, তবু বললাম ত।

এতক্ষণ পরে সোমনাথ বলিল—তুমি সত্যি কলকাতা যেতে চাও?

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল পুষ্প, বলিল—তুমি সত্যি নিয়ে যেতে চাও?

হাসি থামাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—তুমি বড্ড ছেলে মানুষ সোমনাথ দা, কিচ্ছু বোঝ না।

পুষ্পের মুখে সে বড্ড ছেলেমানুষ শুনিয়া হাসি চাপিতে পারিল না সোমনাথ। হাসিতে হাসিতে বলিল—কি বুঝি না পুষ্প? তোমার কথা?

হাসিতে হাসিতে পুষ্প বলিল—আমার কথা নয় গো, আমার মাথা।

বাড়ী আসিয়া গিয়াছিল। ফটক পার হইয়া পুষ্প বাড়ীর মধ্যে দৌড়াইল, বলিল—কি বোকা তুমি!

বিয়ের আগের দিন আট দশজন আত্মীয় বন্ধু লইয়া ব্রজনাথ আসিয়া পৌঁছিল। ইন্দ্র, সোমনাথ ও উমানন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া বরযাত্রী দলকে অভ্যর্থনা করিল।

জীবানন্দের শরীর ভাল নয়, তিনি আড়ম্বর একেবারে বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। ইন্দ্রের হস্তক্ষেপে তাহা সম্ভব হইল না। নির্বিঘ্নে বিবাহ শেষ হইল।

পরের দিন বরকনে রওনা হইবার কিছুক্ষণ আগে গ্রামের আরও কয়েকটি মেয়েকে লইয়া লক্ষ্মী সরস্বতীকে সাজাইতেছিল। হঠাৎ তাহার সোমনাথের কথা মনে হইল। সোমনাথ আজ চলিয়া যাইবে। আজ এত দিন ধরিয়া সোমনাথ তাহাদের সকলের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে যে তাহার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথাটা শেষ মুহূর্তে মনে পড়িল। মনে পড়িয়া লক্ষ্মীর মনকে বেদনাতুর করিল। সে সোমনাথের খোঁজে লোক পাঠাইল।

লক্ষ্মী ছাড়া আরেকজন সোমনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তায় আকুল হইল। সে পুষ্প।

পুষ্প অল্প কয়েকটি দিন সোমনাথের সঙ্গে মিশিয়াছে। দুই ছেলে মানুষ ঝগড়া ও ভাব করিতে করিতে কয়েকটা দিন কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, বিচ্ছেদের মুহূর্ত যেন হঠাৎ আসিয়া পড়িল। পুষ্প ছেলে মানুষ, জানে না কিসে কি হইল; মাত্র কয়েকটি দিনের পরিচিত এই প্রিয়দর্শন খেলার সাথীটি আজ চলিয়া যাইবে ভাবিয়া এক অস্পষ্ট, অবোধ্য বেদনায় তাহার ক্ষুদ্র চিত্ত ভার হইয়া উঠিল।

সোমনাথের যাওয়া বন্ধ করিবার সম্ভাবিত উপায় সম্বন্ধে কত কল্পনা তাহার মনে উদয় হইল। শেষ পর্যন্ত এই সব কল্পনা বাতিল করিয়া অঞ্চলের নীচে দুইটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা জানাইল—হে মা কালী, ওর কোন অসুখ করে দাও, যাতে আজ ওর যাওয়া না হয়! হে হরি, ওর খুব জ্বর করে দাও, যাতে ও আজ না যেতে পারে!

পুষ্প দেখিল দেবতারা তাহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না, সোমনাথের যাইবার সময় আগাইয়া আসিল। হতাশ হইয়া লোকের ভিড় হইতে সরিয়া সিঁড়ির পাশে খালি ঘরের এক কোণে বসিয়া পুষ্প কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখমুখ আরক্ত করিয়া তুলিল।

যাহারা সরস্বতীকে সাজাইতেছিল তাহাদিগকে তাগিদ দিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গিয়া সোমনাথ দেখিল পাশের ঘরের এক কোণে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পুষ্পের মত কে বসিয়া আছে।

ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হইয়া সোমনাথ দেখিল পুষ্পই বটে। সে বলিল—পুষ্প, আমরা এবার রওনা হব।

দুই আরক্ত চোখ তুলিয়া পুষ্প চাহিল। এক দৃষ্টে সোমনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আবার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

সোমনাথ নির্বাক হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল।

বর কনে যাত্রা করিল। পুষ্প তখনও একভাবে বসিয়া রহিয়াছে। পরাশ্রিতা, ক্ষুদ্র পুষ্পের কথা কাহারও মনে হইল না।

বিয়ের দিন সাতেক পরে ইন্দ্র রাজনগরে বসিয়া সংবাদ পত্রে পড়িল অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

কয়েকদিনের মধ্যে য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

লুপুংগুটু

উদয়ন, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত, সমালোকগণ কর্ত্তৃক বহু প্রশংসিত নয়টি গল্পের সংগ্রহ। "লুপুংগুটু" চাইবাসার কাছে একটি হো পল্লীর নাম, প্রথম গল্পটি শেষ হইয়াছে এই আদিবাসী পল্লীর পটভূমিকায়। এই সংগ্রহে আছে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, কথা সাহিত্যের রচনাশৈলী, ভাব ও বর্ণনা বৈভবের দর্শনস্বরূপ, প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বিখ্যাত গল্প "কনকলেখা"। বিদগ্ধা, সৌন্দর্যশালিনী বারবনিতা কনকলেখা এথেন্সের পেরিক্লিস যুগের hetaera—কুলশ্রেষ্ঠা আসপাসিয়ার কথা, মৃচ্ছ-কটিকের বসন্তসেনার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। আর আছে বাস্তব ও অবাস্তব পরিবেশের বিস্ময়কর সমাবেশে রচিত প্রসিদ্ধ গল্প কীর্তি নারায়ণ। মূল্য ২৲

আগমনী প্রকাশক
১৭ বালিগঞ্জের প্লেস, কলিকাতা-১৯

দেবানন্দ

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আশ্রয় করিয়া রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮এর মধ্যে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের আশা আশঙ্কা, ভাব ভাবনা, উপলব্ধি ও উদ্যমের জীবন্ত চিত্র। সে দিনের শিক্ষিত, আদর্শবাদী, আত্মত্যাগী, অমিতকর্মী তরুণ বাংলার বিগ্রহ দেবানন্দ। তাহার সঙ্গে পরিচয় এ যুগের তরুণের পক্ষে হইবে পঞ্চাশ বছর আগে তোলা তাহার নিজের বিস্মৃত চিত্র দর্শন।

পঞ্চাশ বৎসরে তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইয়া যে সমস্যা দেশ, সমাজ, মানুষের জীবন ও হৃদয়কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছে তাহার কুটিল, কণ্টকিত, কৃষ্ণবর্ণমূল মাটি খুঁড়িয়া প্রদীপ্ত আলোকে সকলের দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, এই উপন্যাসে।

মূল্য ৪৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

স্ফুলিঙ্গ

জাতীয় আন্দোলনের প্রমাণিক ইতিহাস আশ্রয় করিয়া রচিত তৃতীয় উপন্যাস। ১৯০৮ (দ্বিতীয়ার্দ্ধ) হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার সময় পর্যন্ত কালের বাংলা দেশের কাহিনী। মূল্য ২॥০

আগমনী প্রকাশক
১৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯